নহেন। রচনার যে-পারিপাট্য মানুষের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে, তাঁহার লেখায় কোথাও তাহার অভাব ঘটে নাই। কেবল মনোরম বর্ণনা-বৈচিত্র্যই নয় শুধু, সুসংযত ও সাবলীল ভাষাচাতুর্য্যও তাঁহার নাটকখানিকে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। আমরা মন্মথবাবুর উন্নতি কামনা করি।

রেখা

শ্রীকণকলতা ঘোষ প্রণীত

কবিতার বই। প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। দাম বারো আনা ও একটাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ক প্রায় পঞ্চাশটি কবিতা আছে। কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রেমের কবিতাগুলিতে একটা সহজ আত্মনিবেদনের সুর আছে, তাহা উপভোগ্য। অযথা উচ্ছ্বাসের আবর্ত্তে পড়িয়া লেখিকা কোথাও কবিতাকে ভূষণভারে ক্লান্তগতি করিয়া তুলেন নাই। লেখিকার ইহাই বোধহয় প্রথম কবিতা-গ্রন্থ। সেই হিসেবে তাঁহার উদ্যম সবিশেষ প্রশংসনীয়। কোনো কনো কবিতায় ছন্দের জড়তা ও ভাষার আড়ষ্টতা চোখে পড়িল। আশা করি, লেখিকা ভবিষ্যতে এসকল সামান্য দোষ-ত্রুটী কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন। গ্রন্থের ছাপা এবং বাঁধাই ভালো।

—সত্যব্রত

মঞ্জুষা

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি-এল, কবিশেখর।

প্রকাশক—শ্রীজগদীশচন্দ্র গুহ, গুহ-ভিলা, পাবনা। মূল্য—৺০ আনা; বাঁধাই ১৲ টাকা।

এই গ্রন্থখানির ভূমিকায় রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর বলিয়াছেন—"রত্নপূর্ণ এই মঞ্জুষা; কিন্তু কোন্ রত্নের মঞ্জুষা ইহা, তাহা তিনি বলেন নাই। মুক্ত করিয়া দেখা গেল—অধিকাংশ রত্নগুলিই গভীর বেদনা-সাগরের গোপন-মুক্তা। রত্নকারের যত্নকৃত ভাণের 'পালিশ' ইহাতে নাই বলিয়া শিল্প সৌন্দর্য্যে চমকপ্রদ না হইলেও, ইহা প্রাণের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে।"

"সকলের মুখে চাই—সেই মুখ খুঁজি
আমার হারানো ধন ফিরে পাব বুঝি।"

এই একটি মাত্র সুরের দ্যুতি ইহার প্রত্যেকটি মুক্তায় করুণ হইয়া ফুটিয়াছে!

"আমার চিতার পাশে কেহ যেন নাহি আসে
বনফুলে ভরিয়া আঁচল"—

পড়িতে চোখে জল আসে।

'শেষ' নামক কবিতাটি সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। দেশ সম্বন্ধীয় কয়েকটি কবিতাও ইহাতে আছে।

কবির মতে—"বিশ্ববুকে বাঁচতে হলে
মরার মত মরতে হবে।"

কবি তরুণ হইলেও কামায়নের অনেক উর্দ্ধে নারীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তুমি আদি মাতা, আদি গুরু তুমি, জীবন করেছ দান, নিখিল বিশ্ব মনে প্রাণে জানে কোথায় নারীর স্থান।

ইহার শেষাংশে সন্নিবেশিত গানগুলিতে সুস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথের ছায়া আসে—ভাষায়, ছন্দে, এবং ভাব প্রকাশের ভঙ্গিতেও।

মিলের দিকে অসাবধানতার আধিক্য অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। যুক্তাক্ষরের বর্ণবৃদ্ধি-নীতি সর্ব্বত্র পালিত হয় নাই। রাঙ্গা, ভাঙ্গা ইত্যাদি দেখিয়া বিশ্বকবির বচন মনে পড়ে—

ঝিঙা না ভাজিয়া ভাজিলে ঝিঙ্গা
তখনি ছন্দ ফুঁকিবে সিঙ্গা।

প্রসাদগুণ আছে।

নামের শেষে কবিশেখর জুড়িয়া না দিলে ক্ষতি কি?

IMPERIAL LIBRARY

Published by Dinesh Ranjan Das from 10-2, Patuatolla Lane and Printed by the same at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Bowbazar, Calcutta.

কল্লোল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

৭ম বর্ষ—১৩৩৬ ; নবম সংখ্যা, পৌষ,

বার্ষিক মূল্য ৬।০ ; প্রতি সংখ্যা পাঁচ আনা

১০।২ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

কল্লোল পৌষ, ১৩৩৬

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১। সঙ্কেতময়ী	(কবিতা)	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪৫৩
২। ব্যঙ্গ	(গল্প)	শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়	৪৫৪
৩। মালা	(কবিতা)	শ্রীনীলিমা রায়	৪৭৪
৪। কাজল-লতা	(বড় গল্প)	শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	৪৭৫
৫। ভিক্ষুক	(কবিতা)	শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী	৪৮২
৬। চরিত্রহীন	(প্রবন্ধ)	শ্রীঅবনীনাথ রায়	৪৮৩
৭। মানব	(কবিতা)	শ্রীশিশির ঘোষ	৪৮৬
৮। তোমাকে	(কবিতা)	শ্রীপ্রণব রায়	৪৮৭

কল্লোল ১৩৩৫ সম্পূর্ণ সেট ৩৲ ডাকে ৩৷৷০

কেশরঞ্জন

গুণে ও গন্ধে

অপরাজেয়

কেশরঞ্জন

মা লক্ষ্মীদের

নিত্য ব্যবহার্য্য

বিষয়-সূচী

কল্লোল পৌষ, ১৩৩৬

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
৯। রাতের বাসা	(উপন্যাস)	শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ	৪০৮
১০। ভবিষ্যৎ	(কবিতা)	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৪৯২
১১। চলচ্চিত্র		ডি-আর	৪৯৩
১২। প্রবাহ		শ্রীসত্যেন্দ্র দাস	৪৯৫
১৩। পুস্তক ও পত্রিকা পরিচয়-লিপি			৪৯৮

চিত্র

ডাঃ কালিদাস নাগ, ডি-লিট্

পাঠে আনন্দ

প্রায় ৫০ বৎসর বিনামূল্যে সাধারণের উপকারের জন্য গ্রন্থখানি বিতরিত হইতেছে। ৭৫০০০ হাজার লোক পাঠে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। গ্রন্থের নাম "কামশাস্ত্র"। আজই কার্ড লিখিয়া প্রাপ্ত হউন। এই গ্রন্থকর্ত্তারই আবিষ্কৃত বহু পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ—

বটীকা

"আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" ইহা শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ ও ধাতু দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির যম।

প্রতি কৌটার মূল্য—

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কল্লোল ১৩৩৫ সম্পূর্ণ সেট ৩্ ডাকে ৩৷৹

বেয়ানের আমার মনটী বেশ,
তত্ত্ব করেছে কেক্ সন্দেশ

শীতের তত্ত্বে বেয়ানকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে আমাদের উপাদেয় মিষ্টান্ন গুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

বান্ধব মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

একমাত্র বিশুদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা

১১৮নং আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীট,

ফোন নং ৩১৪৭ বড়বাজার

প্রাণের মল্লিকফ্লুট

আনন্দ হারমোনিয়ম

সুর সাধনায় এমনটী তো আর হয় না—অর্থাৎ—

যেমনটী চান তেমনি!

ভাল হারমোনিয়ম তাকেই বলে, যার সুর-সমন্বয় ভাল। সুরের মিষ্টতা যদি বলেন—

"মল্লিকফ্লুটের" তুলনা নাই

গঠন পারিপাট্যে সুন্দর, দাম সস্তা অথচ মজবুত।

অন্যত্র যাইবার পূর্ব্বে আমাদের দোকানে একবার পদধূলি দেবেন।

সাইকেল, হারমোনিয়ম রেডিও ও বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা

মল্লিক ব্রাদার্স

১৮২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন—কলিঃ ২৮৭৭ টেলিগ্রাম—ফনোগ্রাফ্

ডাঃ কালিদাস নাগ,
ডি-লিট্

৭ম বর্ষ, পৌষ

কল্লোল

১৩৩৬ ৯ম সংখ্যা

সঙ্কেতময়ী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মুকুরে বসিয়া বেণী বাঁধিতেছ, আঁচল পড়েনি খসে' ;
যদি আজ যাই, নিশ্চয় চোখ ভরিবে না সন্তোষে।
আজি তুমি কত দূরে—
শুভকামনার প্রদীপ জ্বালিবে একদিন সিন্দূরে!
দু'হাত বাড়ায়ে আকাশ চেয়েছি, চেয়েছি বসুন্ধরা,
একদা চমকি' চাহিয়া দেখিব, তুমি এসে দেছ ধরা।
আকাশ আনিয়ো অঞ্চল ভরে', সাগর সাশ্রুচোখে,
স্বল্পক্ষণের তরে মোরে নিয়ো কবির কল্পলোকে।
কোমল দেহাবরণে
সুধার সৌধ লুকায়ে রাখিয়ো অপরিচয়ের ক্ষণে।
সঙ্কেতময়ী! প্রার্থনা করি, হ'য়ো না আবিষ্কৃত,
তোমার মাঝারে যেন অনুভবি—জীবন অপরিমিত।
বড়ো ক'রে দাও ঘর,
অরণ্য হ'তে এনো লাবণ্য—চঞ্চল মর্ম্মর।
ঊষার ভূষণ কোথা পাব, তারা করি নাই আহরণ,
এতদিন শুধু স্বপ্ন দেখেছি—তাই কো'রো আভরণ।
অপার সে পারাবার—
গভীর অগাধ স্বাদ নিয়ে এসো অপরিপূর্ণতার॥

ব্যঙ্গ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সহরের মধ্যে সে-অংশটার খ্যাতি বা শ্রী কোনটাই ছিল না। তাহারই এক কোণে, পুরাণো দ্বিতল একখানি বাটীর মধ্যে, কলা-লক্ষ্মীর কয়টি নিষ্ঠাবান উপাসক যে কেমন করিয়া এবং কবে প্রথম বসবাস সুরু করিয়াছিল, এতকাল পরে সেকথা তাদের মনে নাই। কিন্তু, তাহার চেয়ে ভদ্র স্থানের অভাব যে ছিল না, এ কথা স্বীকার করি।

রঙ ও রেখার প্রতি অনুরাগ ছেলে বয়স হইতেই ছিল, একদিন সেই শিল্পী-গোষ্ঠীতে ঢুকিয়াও পড়িলাম। তখনো মানুষের জীবনের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় নাই, অর্থাৎ মানুষ সম্বন্ধে সকল কথাই অসংশয়ে বিশ্বাস করিতে কোন দ্বিধা ছিল না। কথাটা আর এক ভাবে বলা যায়। কৈশোর যেদিন সেই মাত্র শেষ হইয়াছে, যৌবনের বিরাট তোরণের সামনে আসিয়া বিস্ময়ে আমি নির্ব্বাক হইয়া গেছি! যেখানে যা' কিছু দেখি, তাহাই অপূর্ব্ব এবং অকল্পিত!

সংসারে বাঁধন কিছু ছিল না, বাধাও না।

কিন্তু মেসে পা দিয়াই বুঝিলাম, এ এক নূতন জগৎ বটে!

এখানে এক সপ্তাহ নিজের ঘরে পড়িয়া উপবাসে কাটাইয়া দিলে কেহ কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করে না, মেসের সহিত সংস্রব না রাখিলেও কেহ অনুযোগ করিতে আসে না। মেসে ম্যানেজারও আছেন, মাহিনা করা পাচক এবং পরিচারিকাও আছে, কিন্তু শেষের দুই জনকে মাসের মধ্যে দিন দশেকের বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না, কারণ বাকি কটা দিন রান্না ঘরের সহিত মেসের কাহারো সম্পর্ক না রাখিলেও চলে।

নীচের তলায় দু'ঘর দর্জ্জি, একটা বিড়ির দোকান এবং 'স্বদেশী আইস ফ্যাক্‌টরী'। রাত্রে দর্জ্জিদল মেসিন ফেলিয়া হারমোনিয়াম লইয়া সঙ্গীত-সরস্বতীর উপর অযথা অত্যাচার করে; স্বর্গে সংবাদপত্র থাকিলে ঐ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা হয় নিশ্চয়ই! বিড়ির দোকান সন্ধ্যার পরেই বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু 'আইস ফ্যাক্টরী' রাত্রি দুইটার আগে বন্ধ হয় না। এ অঞ্চলে ওই বস্তুটার চাহিদা একটু বেশী।

উত্তর দিকের যে ছোট ঘরটিতে আসিয়া ঢুকিলাম, তাহার জানালা খুলিলেই অদূরে কতকগুলি বড় বড় বাড়ী চোখে পড়ে, রাত্রে সেগুলির মধ্যে যে অপরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা শয্যায় পড়িয়া স্পষ্টই শুনিতে পাই।

পাশেই থাকেন শিবসুন্দর বাবু। কিন্তু চেহারার মধ্যে শিবত্ব বা সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। প্রথম যেদিন লোকটিকে দেখি সেদিন তাঁহার সম্বন্ধে যে-ধারণা করিয়াছিলাম সেটা কাহারো পক্ষে গৌরব-জনক নহে।

শিববাবু সৌখীন মানুষ, চোখের কোল দুটি বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু নাকটা ঠিক সেই পরিমাণে উদ্ধত, সমস্ত শরীরের ওজন বোধকরি পঁয়ত্রিশ সেরের বেশী নয়,—যদিও বয়স তাহার চেয়ে কিছু বেশী; কিন্তু চশমা, লম্বা চুল, মোটালাঠি,—এ সব এখনও নিয়মিত ভাবেই ব্যবহার করেন। ঘরে তাঁহার আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, যা-ও বা ছিল তাহার মধ্যে বেঁটে এবং গোলাকার একজাতীয় বোতলই অধিক। তাছাড়া একটা ক্যানভাস এবং ষ্ট্যাণ্ড, একটা ভাঙাতক্তপোষ, টীনের তোরঙ একটি,—আর কিছু নয়।

প্রথম সাক্ষাতেই বলিলেন, ঘোড়ারোগ আবার কদ্দিন থেকে ধরলো হে! চেহারায় ত' একদম কচি,—যাকে বলে—'সদ্য বিকশিতাঙ্গী'! কথা কটা খুব প্রফুল্লকর নয়, হই-ও নাই। কিন্তু পরের দিন এক সময় নিজেই

ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই 'আর্টিষ্টলজের' সন্ধান পেলে কোথায়? সহরে কি আর জায়গা জুটল না?

বলিতে ভুলিয়াছি, মেসটির নাম ছিল 'আর্টিষ্টস্ লজ'। আমি কোনো উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, বাড়ী থেকে পালিয়েচো, কেমন? সৎ-মার অনুগ্রহে? বলিলাম, না, ও-সব বালাই নাই।

শিববাবু চোখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ও, তাই। কিন্তু, বাড়ী যাচ্ছ কবে?

বলিলাম, সে ইচ্ছা আপাততঃ নাই, থাকিব বলিয়াই—

হঠাৎ শিববাবুর মুখের ভাব এবং কণ্ঠস্বর কঠিন হইয়া উঠিল, কহিলেন, সে হয় না, কাল সকালে উঠেই আর কোথাও যাবার ব্যবস্থা করবে।

কেন?

কেন? পৃথিবীতে মরবার জায়গা এর চেয়েও ঢের বেশী সুন্দর আছে। তুমি এখানে থাকতে পাবে না।

মনে আছে, শিববাবুর এ আদেশ আমি সহ্য করিতে পারি নাই। বলিয়াছিলাম, টাকা দিই, থাকব নিশ্চয়ই। আপনার বাধা দেবার কোনো অধিকার নেই।

শিবসুন্দর আর কোনো কথা বলেন নাই, নিঃশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার ঘর হইতে বোতল খুলিবার শব্দ আসিয়াছিল এবং স্খলিত কণ্ঠের গান শুনা গিয়াছিল,—

"With thee prison is a heaven of delight.
With thee desert, a bed of rose"

শিববাবুর পাশের ঘরে থাকিত মুকুল চৌধুরী। চৌধুরীর বয়স চল্লিশের উপর, কিন্তু মনটা যেন আজও চব্বিশের দেশে!

এই লক্ষ্মীছাড়া যুবক ও প্রৌঢ়গুলিকে ছবি আঁকিতে শিখাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই কোনো মতে চলিয়া যায়। জীবনে প্রয়োজনকে তিনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেই সঙ্গে আশা এবং আকাঙ্ক্ষাও ছোট হইয়া গিয়াছে। 'জরাজীর্ণ আর্টিষ্ট্‌-লজের অপরিসর একটা ঘরে গুটিকতক দেহে এবং মনে একান্ত উপবাসী ছাত্রকে লইয়া তিনি সন্তুষ্ট। মেসের ম্যানেজার তিনিই; যখন অর্থের অকুলান হয় তখন মেম্বরদের তাগাদা দিয়া অস্থির করেন না, নির্ব্বিবাদে তাহাদের সহিত উপবাস করেন। আর্টিষ্টস্ লজে আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি আশঙ্কায় অস্থির হ'ন নাই, পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, হিয়ার ইজ এ্যানোদার 'উড্-বি' মিকালেঞ্জেলো!

মাসিক চার টাকা বেতনে চৌধুরী আমাকে অঙ্কন বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবার আশা দিলেন;

বাপ-মায়ের মৃত্যুর পর কিছু টাকা—সামান্যই,—হাতে আসে, তাহাই লইয়া উঠিয়াছি এই মেসে। আর যাই হ'ক উপবাসের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু, আবার একেলার সামর্থ্যে সকলের অভাব ঘুচাই কেমন করিয়া?

ফটোগ্রাফি শিখিলে টাকা উপায়ের একটা সুদূর সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া একদিন ক্যামেরা, ষ্ট্যাণ্ড, প্লেট প্রভৃতি কিনিয়া আনিলাম। চৌধুরীই এ বিষয়ে সাহায্য করিলেন।

সময়ে নাওয়া-খাওয়া না-হওয়ার ফলে একদিন হঠাৎ জ্বরে পড়িয়া গেলাম। মেসের সকলেই উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু শুশ্রূষা করিতে আসিলেন শিবসুন্দর একা!

বলিলেন, মানুষের মন আজ এত ছোট হয়ে গেছে যে কারো কোনো কাজ যে সত্যিই স্বার্থশূণ্য হ'তে পারে এ'কথা তাকে বিশ্বাস করানো কঠিন। সেদিন তোমায় যখন মেস ছাড়তে বলেছিলুম, তখন তুমি···, কিন্তু আজ বোধহয় তোমার ভুল বুঝতে পারচো!

মনে আছে শিববাবুর কথার কোনো উত্তরই সেদিন দিতে পারি নাই। শিবসুন্দর সেদিন আরও যেকথা গুলি বলিয়াছিলেন, তাহাও আজ পর্য্যন্ত মনে করিতে পারি।

সেদিন সন্ধ্যায় সঙ্কীর্ণ সেই ঘরটিতে আলো ছিল না, শিয়রে বসিয়া শিববাবু বলিয়াছিলেন, এদেশ শিল্প

চায়, কিন্তু শিল্পীকে চায় না। এ দেশের যারা বড় লোক, তারা এই ছবিওয়ালাদের দয়ার যোগ্য ছাড়া আর কিছু মনে করেন না। কুসুমপুরের জমিদারের মেয়ের একখানা ছবি আমায় আঁকতে হয়েছিল। কাজ যেদিন শেষ হ'ল সেদিন জমীদার বললেন, 'ওটা গিন্নীর একদম পছন্দ হয় নি, কি করা যায় বলুন ত! যাক যা' দোবো বলেছিলুম তা'র আদ্দেক আপনি নিন। গরীব মানুষ,—সময় ত' আপনার বড় কম নষ্ট হয় নি।' কিন্তু মজা এই যে, ছবিটি অপছন্দ হওয়া এবং আমার ফেরত চাওয়া সত্ত্বেও সেটি তার খাস কামরায় ঝুলানো আছে।

প্রায় দিন পনেরো শয্যাগত ছিলাম। তা'র মধ্যে শিববাবুর আর অন্য কাজ ছিল না, কেবল আমাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। স্নানাহার করিতেন কি না, করিলেও কখন করিতেন, কিছুই বুঝিতাম না।

মেস-জীবনের তিনটি মাস কাটিয়াছে, সকলের সঙ্গে পরিচয়ও হইয়াছে অল্প বিস্তর। কিন্তু শিববাবু লোকটিকে বুঝিতে পারিলাম না আজও। বাড়ীতে থাকিলে গান করেন, মদ খান এবং ছবি আঁকেন, কিন্তু কাহাকেও কোনো কথা না জানাইয়া মধ্যে মধ্যে কোথায় যে ডুব দেন, সেকথা এত বড় শিল্পী-গোষ্ঠীর কেহ বলিতে পারে না। ঘরের মধ্যে আলো না জ্বালিয়া একা একা চুপ চাপ পড়িয়া থাকা যেন শিববাবুর মস্ত একটা বিলাস।

পঙ্কজ চৌধুরী লোকটিও কি কম অদ্ভুত!

এই বুড়া বয়সে সে নাকি এক ব্যারিষ্টার-দুহিতার প্রেমে পড়িয়াছে, অবশ্য ছবি আঁকিতে গিয়া। সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষ্কাম প্রেম কি সত্যিই হয় না মশাই? কিন্তু, উপন্যাস-টুপন্যাসগুলোয় ত সেরকম অনেক দেখা যায়।

বলিতে পারিতাম, জীবনটা উপন্যাস নয়, নিষ্কাম প্রেমও তাই সুলভ নয়। যদি হইত, তবে এসম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করিয়া নীরবে সাধনা করিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিন এ পৃথিবীর বহু সত্যের সঙ্গেই কোন পরিচয় ছিল না, তাই বলিয়াছিলাম, আছে বৈ কি, নইলে এত' কাব্য-নাটক লেখা হ'ল কি দিয়ে?

চৌধুরী অতঃপর নিষ্কাম প্রেম-সাধনা সুরু করিয়া দিলেন। ব্যারিষ্টার-দুহিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবিতা লিখিবার আয়োজন করিলেন, পূর্ব্বে দাড়ি গোঁফ কামানোর প্রতি লক্ষ্য ছিল না, এখন সেটা নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল।

মেশ শুদ্ধ সকলে সেদিন হইতে বুড়া চৌধুরী মশায়কে অস্থির করিয়া তুলিল। ছেলে-ছোকরার দল একদিন চৌধুরী মশায়ের একটি অসম্পূর্ণ কবিতা দেখিয়াছিল, দেখা হইলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, আকাশে ধুমকেতু আসে, তারা দেখা যায়, কিন্তু নক্ষত্রগুলো যে চোখ টিপে ইসারা করে তা' এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি। ভারি মৌলিক হয়েচে ওটা। কিন্তু ইসারার মানে কিছু বুঝতে পারেন?

চৌধুরী বিব্রত হইয়া বলেন, তোমরা ভারি বাজে কথা বলো! মানুষকে ব্যঙ্গ করা সহজ কিন্তু বোঝা ঢের কঠিন, এ'কথা সেদিন জানতাম না।

মেসের একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীনতায় বিরক্তি আসিতেছিল, এমন সময় একদিন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। দক্ষিণ দিকের একটা ঘর খালি ছিল, একজন নাম করা আর্টিষ্ট আসিয়া সেটি দখল করিলেন। শিববাবুর সহিত এককালে তাঁহার পরিচয় ছিল, আমাকে তিনি তাঁহার অধীনে শিক্ষানবীশিতে বাহাল করিয়া দিলেন।

মনে করিয়াছিলাম, এইবার আমার সৌভাগ্যের সিংহ দ্বার না-খুলিয়া যায় না, লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া তুলিবার জন্য তুরী ভেরী বাজে বুঝি! কিন্তু দিন কয়েক যাইতে না যাইতে স্পষ্ট বুঝা গেল, সে-সম্ভাবনা বিশেষ নাই।

রাধাকান্ত ফটো আর্টিষ্ট। বয়স ত্রিশের মধ্যে, কিন্তু ক'টা গোঁফ এমন কঠিন এবং উদ্ধত এবং মুখের ভাব এমনি ভয়াবহ যে তাহার চেয়ে বেশী মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয়! রাধাকান্ত আমার প্রতি যে-কাজের ভার দিতেন, সেগুলি প্রায়ই খুব গৌরবজনক হইত না। ক্যামেরা

এবং ক্যামেরা, ষ্ট্যাণ্ড ও অন্যান্য সরঞ্জামগুলি কাঁধে ঝুলাইয়া তাঁহার সহিত যাওয়া আসা করিতে হয়।

এই কুলীগিরি যখন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ একদিন কোথা দিয়া কি হইয়া গেল।

সেদিনটি আমার জীবনে বহুকাল পূর্ব্বে অতীত হইয়া গেছে, সন-তারিখ কিছুই মনে নাই,—সেদিন তাহার কোনো আবশ্যকতাও বোধ করি নাই, কিন্তু আজ যখনই সেই দিনটি মনে পড়ে তখনই সেটি চিরনূতনের বেশে উপস্থিত হয়। সন-তারিখ কিছু মনে করিয়া রাখি নাই, সেজন্য লজ্জারও আমার অন্ত নাই!

কিন্তু মানুষের জীবনে এক-একটা দিন এমনি অপ্রত্যাশিত সমারোহ লইয়াই উপস্থিত হয় বটে! জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলির সহিত তাহার তুলনা হয় না এবং পরবর্ত্তী জীবনের কোনো এক প্রদোষান্ধকারে তা'র কথা মনে পড়িলে হঠাৎ সেটাকে অসম্ভব এবং সঙ্গতিহীন বলিয়া মনে হওয়াও আশ্চর্য্য নয়।

ফাল্গুনের বেলা,—প্রায় দুইটা।

রাধাকান্ত হাতে একখানি রঙীন খাম দিয়া বলিলেন, এটা দিয়ে এসো।

পথে বাহির হইয়া দেখি নামটি স্ত্রীলোকের, বাড়ীটি আমাদের মেসের খুব বেশী দূরে নয়, অর্থাৎ এই অঞ্চলে-ই। খামখানি খোলাই ছিল, লেখা বাহির করিয়া পড়িয়া ফেলিলাম। হুবহু সকল কথা মনে নাই, তবে এটুকু মনে আছে যে শিরোনামায় উল্লিখিত সরসীর সহিত রাধাকান্তের সেদিন ফটো তুলিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কিন্তু সময়াভাবে রাধাকান্ত যাইতে পারে নাই এবং সেই কারণেই চিঠি। আর্টিষ্টদের ভাষায় সরসী রাধাকান্তর 'মডেল', পরিচয় অনেক দিনের। কথা না রাখিতে পারার জন্য বেচারা আর্টিষ্ট সেদিন সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল।

সরসীর বাড়ীর ভিতরে পৌঁছিয়া দেখি—সকলেই নিদ্রা-মগ্ন। যে হতভাগারা আর্টিষ্টদের কাজে সাহায্য করে, তাহাদের প্রায়ই এই শ্রেণীর বাড়ীর মধ্যে পদার্পণ করিতে হয়। ইহারা যে রাত্রিচর তাহা জানিতাম, তাই কোথাও সাড়া শব্দ না পাইলেও উপরে উঠিয়া গেলাম,—নিতান্ত সহজ ভাবেই।

এ বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে আসি নাই, ঘরটা খুঁজিয়া লইতে একটু দেরী হইল। দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ, বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম। নিতান্ত সহজ ভাবেই ডাকিলাম, কিন্তু উত্তর দিয়া যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে দেখিয়া হঠাৎ কোনো কথাই মুখে আসিল না।

সরসীর সেই নিদ্রাকাতর মুখখানি, আলুথালু কেশপাশ, আজও মনে আছে। সে-ও আমার দিকে চাহিয়া হঠাৎ যেন স্থান-কাল ভুলিয়া গেল!

জীবনে এমন একটি মুহূর্ত্ত কখনো কখনো আসে যখন সমস্ত নিঃশব্দতা হঠাৎ বুকের মধ্যে বাঙ্ময় হইয়া উঠে,—সরসী ও আমার জীবনে সেদিন তেমনি একটী মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল বুঝি!

রাধাকান্তর চিঠিখানি নিঃশব্দেই সরসীর হাতে তুলিয়া দিলাম। সরসী চিঠি-খানি পড়ে নাই, হাসিয়া বলিয়াছিল, একটু বসুন, উত্তরটা নিয়ে যাবেন।

ঘরটি খাট, আয়না, তাকিয়া, চেয়ার ইত্যাদি দিয়া সাজানো। চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ যায়, সরসীর দেখা নাই। অধৈর্য্য হইয়া চুপি চুপি পলায়নের উদ্যোগ করিয়াছি, এমন সময় এক থালা খাবার ফল-মূল লইয়া উপস্থিত।

বলিলাম, মাফ করবেন, অসময়ে ওসব খাওয়া অভ্যেস নেই।

সরসী ছাড়ে নাই, খাইতে হইয়াছিল। শেষ করিয়া বলিলাম, কই, উত্তরটা দিন।

সরসী হাসিল। বলিল, লেখা হয় নি,...থাক্। উত্তর পাবার সম্ভাবনা না-থাকলে বসতেন না বোধ হয়?

সেদিন অত শত বুঝিতাম না। বলিলাম, একথা কেন?

সরসী বলিল,—না, এমনি।

ঘরের বাহিরে আসিলাম, সরসী দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু বাহিরে আসিয়া খোলা জানালার মধ্যে চাহিতেই দেখিলাম, সরসী পাথরের মত দাড়াইয়া আছে, চোখে জল!

আশ্চর্য্য! সরসী নিশ্চয়ই সেই কুশ্রী রাধাকান্তটাকে··· আজ আসিবে না শুনিয়া কাঁদিতেছে! ফিরিয়া গিয়া বলিলাম, আপনি কাঁদচেন! কিন্তু যদি বলবার কিছু ছিলই তবে এক খানা চিঠি···

সরসী কথা বলিল না, হঠাৎ আমার ডান হাতটা মুখের কাছে লইয়া গেল! বিস্ময়ের ঘোর যখন কাটিল, তখন আমার হাতের তালুতে তার ছোট ছোট দাঁতের চিহ্ন রক্তের সঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

নারী-হৃদয়ের কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্য সেদিন তাহাকে সেকাজে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহা জানি না, জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই; কিন্তু সরসীর সেই অদ্ভুত আচরণে আমার রাগ হয় নাই এ'টুকু মনে আছে।

বিস্মিত হইয়া হাতের দিকে চাহিয়া আছি, সরসী আবার ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আশ্চর্য্য সেই দুটি চোখ দিয়া কতক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ছোট মেয়ের মত সে কি দুরন্ত কান্না!

ইহা যে কি, কিছুতেই সেদিন বুঝিতে পারি নাই। একবার ভাবিলাম, কী আবার! অসাধু ভাষায় ইহাকেই হয়ত 'ফাঁদপাতা' বলে! কিন্তু ..

সরসী হঠাৎ অসংযত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন এলে? কে তোমায় আসতে বলেছিল! তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আর দেরী করো না, যাও। কিন্তু রাধাকান্তকে বলো, তোমায় যেন আর কোন দিন না পাঠায়। মনে থাকবে ত?

হুঁ।

সরসী হাসিয়া ফেলিল। কহিল, আচ্ছা, সেকথা আমিই তাকে বলবো। তুমি কিছু বলো না। সরসী নিজে যে কিছুই বলিবে না, এ কথা বুঝিবার বয়স হইয়াছিল।

পথে যখন পা দিলাম তখনো প্রখর দিবালোক, লোক জনের ব্যস্ততা, সেই চিরপরিচিত বৈচিত্র্যহীন কোলাহল! কিন্তু সেইগুলিই হঠাৎ অদ্ভুত এবং অপূর্ব্ব মনে হইল! যেন, পৃথিবীর সহিত এতদিন পরে আজই আমার সর্ব্বপ্রথম পরিচয়! এক ঘণ্টা আগে যখন মেস হইতে চিঠি সমেত বাহির হইয়াছিলাম, তখন ঐ কথা কে ভাবিয়াছিল! অথচ—

যাক্।

যেকথা এত সমারোহ করিয়া লিখিলাম, অনেকের কাছেই সেটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অসম্ভব। একদিন আমি নিজেই হয়ত ঐকথা স্বীকার করিতাম। কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তিকে ন্যায়ের সূত্র দিয়া বিচার করিবার কথা আজ আমার নয়।

জন্ম-দরিদ্র যেমন হঠাৎ ধূলায় এক রাশ মণি-মুক্তা কুড়াইয়া পাইলে কোথায় সেগুলি লুকাইয়া রাখিবে ভাবিয়া পায় না, আমার অবস্থাও দাঁড়াইল তাহাই। সরসীর দংশন-চিহ্ন পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে সেরাত্রে মেসে আহার পর্য্যন্ত করিলাম না, হাতটিকে অতিযত্নে লুকাইয়া রাখিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু চিহ্ন মিলাইল না। কতবার যে নিভৃতে গিয়া চিহ্ন কয়টি দেখিলাম তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করিলাম, কেন সরসী এ কাজ করিল,—কিন্তু উত্তর দিবে কে?

তিনদিন, তিনরাত্রি পরে চিহ্ন যখন সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল, তখন ভারি বিরক্তি বোধ করিলাম। আরও কিছুদিন থাকিলে কি এমন অপরাধ হইত!

রাধাকান্তবাবুর কাছে ঐ কয়দিন একেবারেই যাইতে পারি নাই,—সাহস হয় নাই। লোকটার চেহারা মনে পড়িলে রাগ হয়!

মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আদায় নাই, রান্না বন্ধ হইল। চৌধুরী মশাই ছাদের আলিসায় বসিয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। শিবসুন্দরের বিলাতী শুঁড়ির দোকানের বিল ঘন ঘন আসিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর ছেলে, তিনদিন ভাতের সঙ্গে পরিচয় না

হওয়ায় জীবন্মৃত হইয়া আছি। সরসীর জরুরী তলব আসিয়া পৌছিল। কথায় কথায় নাকি মেসের অব্যবস্থার কথা রাধাকান্ত সরসীর কাছে বলিয়াছিল। তাহাতে সরসী জিজ্ঞাসা করে, সবাই এক সঙ্গেই অনশন অভ্যাস করিতেছে কিনা এবং সেদিন যে-ছেলেটিকে চিঠি দিয়া পাঠাইয়াছিলে সে-ও কি?

রাধাকান্তর উত্তর শুনিয়া সরসী সে-রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আবার যখন সরসীর ওখানে পৌছিলাম, তখন রাধাকান্ত সেখানে বসিয়া। আমার পক্ষে লজ্জা হইবার কথা,—কিন্তু উপায় কি? রাধাকান্তই ত নিজের মুখে,—

সরসী বলিল, একটু বসো, খাবার হ'ল বলে। বলিয়াই কোথায় যেন বাহির হইয়া গেল। রাধাকান্তর দিকে চাহিয়া দেখি, মুখখানা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। সমস্তক্ষণের মধ্যে একটা কথাও কহিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকিয়া গেল।

রাধাকান্ত এবং আমি দুইজনে এক সঙ্গে বাহিরে আসিতেছি, রাধাকান্ত একটু অন্তরালে গিয়া বলিল, একটু পরেই আসব বুঝলে?

সরসী কহিল, বাঃ আগে না বললে কি করে জানব? লক্ষ্মী রাগ করোনা, আজ এক জনকে,—

উত্তরে রাধাকান্ত কি বলিল, বুঝা গেল না। সরসী দুয়ারের কাছে আসিয়া আমার হাতে একখানা খাম গুঁজিয়া দিয়া বলিল, এটা এক্ষুণি ফেলে দেবেন, ভারি জরুরী। রাধাকান্ত একটু আগে আগে চলিতেছিল, শুনিল কি শুনিলনা সেই জানে,—এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিল না।

রাধাকান্ত কোথায় চলিয়া গেল। চিঠি ফেলিতে গিয়া হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম, খামের উপর ঠিকানা নাই। টিকিট পর্য্যন্ত নাই। খুলিয়া ফেলিলাম,—মাত্র এই ক'টি কথা:—

মিছে কথা, এখুনি একবার আসতে পারো না?

রাজপথের জনতা, গ্যাসের কোলাহল···সব যেন হারাইয়া গেল। নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। না-ই পারি, কিন্তু এক সময় কি করিয়া যে সরসীর দুয়ারে গিয়া পৌছাই—সে এক বিস্ময়!

সে রাত্রি জাগিয়া কাটিয়া গেল।

সরসী বলিল, তোমার নাম?

আমি বলিলাম, বিভাস। কিন্তু বিভাস আমার নাম নয়। কেন যে মুখ দিয়া ওই নামটা বাহির হইয়া গেল তাও ঠিক জানি না।

সরসী বলিল, তোমার কে আছে?

সত্য কথাই বলিতাম; হঠাৎ মনে হইল, কাজ কি ইহার কাছে নিজের দৈন্যের পরিচয় দিয়া? বলিলাম, সব,—বাপ—মা, ভাই—বোন।

সরসী জিজ্ঞাসা করিল, তবে মেসে কেন?

শিবসুন্দরের কথা মনে পড়িল।

বলিলাম, বাবা বুড়ো বয়সে বিয়ে করে এনেছেন। তাঁর জ্বালায় টিকতে পারলাম না। ছেলেবেলা থেকে ছবির দিকে ঝোঁক,—এসে উঠলাম মেসে। বাবা রাগ করে খোঁজই নেন না, দিদিমা কিছু টাকা উইল করে দিয়ে গেচেন, তাই নষ্ট করচি, আর ছবি আঁকচি।

সরসী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, আমার একটি কথা রাখবে?

কি কথা?

বাড়ী ফিরে যাও।

সে হয় না। অন্যায় অনুরোধ করো না।

আরও কিছুক্ষণ কাটিল। সরসী হঠাৎ ছেলে মানুষের মত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি' বলচি বলে রাগ করোনি ত?

না।

তোমার চোখ দুটো অদ্ভুত!

তোমারো।

আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়। মান্য করে কথা কইবে, বুঝলে?

বেশ।

আচ্ছা, তুমি সাগর দেখেছো?

সমুদ্রের ছবি অনেক আঁকিয়াছি, কিন্তু দেখি নাই। কিন্তু সরসীর কাছে সেকথা স্বীকার করিলাম না। বলিলাম, এই গত বছরই তো,—

সরসী বলিল, তোমার চোখ দুটি ঠিক সমুদ্রের মত আশ্চর্য্য, তা' জানো ?

না। আজ জানলাম।

এমনি অজস্র মিথ্যার মধ্যে দিয়া সরসীর সহিত আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল। সেইদিন সকালেই একটা নোট ভাঙ্গাইয়াছি, আটটাকা তখনো পকেটেই ছিল। ভোর হইতে সেগুলি সরসীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া আসিলাম।

টাকাগুলি সরসী একটু হাসিয়া আমারই সম্মুখে তুলিয়া রাখিয়াছিল।

তখনো পথে লোক চলাচল সুরু হয় নাই, মেসের দরজা বন্ধ।

গতরাত্রির সব কথা চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা-দিল, কিন্তু উপায় কি ?

এমনি-ই হয়।

সরসীর কাছে সেরাত্রে মিথ্যা আত্মপরিচয় দিবার সময় মনে হইয়াছিল, এত বড় বাহাদুরী জীবনে আর কোনো দিন করি নাই। সদ্য পরিচিত কাহারো কাছে নিজের সত্য-পরিচয় অনেকেই দিতে পারে না; আমি-ও পারি নাই, কিন্তু পরদিন মনে মনে ভারি লজ্জা বোধ করিলাম। সরসী আমার কেহ নয়, কোনো ক্ষতিও করে নাই, তবে কেন নিজেকে তাহার সম্মুখে মিথ্যা আড়ম্বরে সাজাইয়া বাহির করিলাম ?

রাত্রে মেসে ফিরি নাই, এজন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিবার কথা নয়, কিন্তু শিববাবু সে নিয়মভঙ্গ করিলেন। ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন,—কাজটা ভাল নয় কিন্তু দোষ দিই কাকে ? যারা জীবনে সমুদ্র দেখেনি, তাদের নদী দেখেই আত্মহারা হওয়া ত' স্বাভাবিক। কিন্তু একটি কথা, মেয়ে-জাতটাকে কোনো দিন বিশ্বাস করো না,—বিশেষ ওদের। কিন্তু ওদেরই বা দোষ কি, ও-জাতটার ত প্রাণ বলে কিছু নেই!

শিববাবু ইতিহাস হইতে অন্ততঃ দশটা নজীর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, নারী জাতির হৃদয় বলিয়া কিছু নাই। স্বার্থ ছাড়া তাহারা আর কিছু বোঝে না। বার্ণার্ড'শ'র কোন গ্রন্থের নায়ক বলিয়াছে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী যখন কাঁদে তখন সে প্রিয়তমের বিচ্ছেদে কাঁদে না, পুত্রের জনকের জন্য কাঁদে, এ' কথায় শিববাবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। এই যদি বিবাহিত নারীর অবস্থা, তবে অন্যের কথা তুলিয়া লাভ ?

পৃথিবীর রমণীর প্রতি শিববাবুর এই প্রচণ্ড বিরাগের কারণ সেদিন জানিতাম না। কিন্তু কথাগুলি ভারি ভাল লাগিয়াছিল এবং অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়াছিলাম।

কিন্তু, কোথায় রহিল রাধাকান্ত, কোথায় রহিল বিচার বিতর্ক, সংশয়! যৌবনের বিচিত্র রঙ-মহলায় প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হইয়া গেলাম :—

রাধাকান্ত এবং আরও কত অপরিচিত ব্যক্তি প্রতিদিন সরসীর দুয়ার হইতে ফিরিয়া যায়। সরসীর সম্মুখে নিজেকে মহিমাময় করিয়া তুলিবার লোভে প্রতিরাত্রে মিথ্যার স্তূপ গড়িয়া তুলি।

সরসী ছেলে-মানুষ হইয়া গেছে। রাত্রি জাগিয়া অজস্র অসংলগ্ন কল্পনার কুঞ্জ রচনা করা ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনো কাজ নাই। জ্যোৎস্না রাত্রে সঙ্গে করিয়া ছাদে লইয়া যায়, আকাশের অসীম বিস্তৃতির দিকে আশ্চর্য্য দুই চক্ষু মেলিয়া মৌন প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবে,—হয়ত তাহার অতীত জীবনের এমনি কোনো রাত্রির কথা, কিম্বা আর কোনো পরিচিতের স্মৃতি,—কে জানে! জানিবার ইচ্ছাও হয় না। তারপর হঠাৎ এক সময়ে খুব কাছে সরিয়া আসিয়া একান্ত নির্ভরতার সহিত বলিতে থাকে,—সহরের অনেক, অনেক দূরে ছোট্ট একটি গাঁ, তা'রি কোলে ছোট একটি একতলা বাড়ী; সেখানে কেবল তুমি আর আমি।

সরসীর মত আমিও হয়ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকি। শিবসুন্দরের কথা মনে পড়ে। সরসীর প্রতি অঙ্গে কত

মানুষের স্পর্শ, আশ্লেষ ও আলিঙ্গন। কত মানুষের কাছেই না এমনি কোনো রাত্রে ঠিক এই কথাই সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে! সরসীর দিকে চাহিয়া ঘৃণা হয়; কিন্তু মুখে আভাস পর্য্যন্ত রাখি না। হাত দুটি ধরিয়া আশ্বাসের কণ্ঠে বলি, ভয় নেই সরসী, সেদিন খুব দূর নয়।

সরসী চুমায় চুমায় মুখ ভরিয়া দেয়।

বলে, সত্যি?

যেন বিশ্বাস করিতে পারে না!

মাস খানেক এই ভাবে কাটিবার পর সরসী একদিন অসুখে পড়িয়া গেল। শিবসুন্দরের কথা স্মরণ করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছি, সরসী বলিল, কি এমন কাজ তোমার? আজকের রাতটি থাকতে পারো না?

সুতরাং পালানো আর হয় না। সরসী সমস্ত রাত্রি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিল, দীপালোকের সামনে আমি একখানা বই লইয়া বসিলাম। রাত্রির গতি বাড়িয়া চলিল। কতক্ষণ উপন্যাসের পাতায় বন্দী হইয়া ছিলাম মনে নাই, এক সময় মুখ তুলিয়া সরসীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর চোখ ফিরাইতে পারি না। কেন জানি না, হঠাৎ মনে হইল, এই মেয়েটীর সমস্ত বিলাস ও বাচালতার অন্তরালে কি একটা অনুচ্চারিত দৈন্য—অতি সংগোপনে লুকাইয়া আছে; প্রতিরাত্রে যাহারা সরসীর সঙ্গ-সুধারস পান করিতে আসে এবং আজও যে তাহার অনতিদূরে বসিয়া আছে, সেকথা তাহারা বুঝে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই। রাত্রির পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে একটি মাত্র ক্ষীণ দীপালোকে সরসীকে বহুবর্ষ-ক্লান্ত বৃদ্ধার মত কুৎসিত দেখায়, মনে হয় বহুরাত্রে এই ঘরটিতে বহুপুরুষে মিলিয়া যে কামনার আগুণ জালিয়া গেছে,—তাহারি ভস্মরাশি ছাড়া ইহার আর কোনো সম্বলই নাই। একটা অনাদ্যন্ত হৃদয়হীন যুদ্ধের কাহিনী তাহার জাগরণ-ক্লান্ত কালি-মাখা গভীর দুই চোখের কোলে, রসহীন ওষ্ঠাধরে যেন অতি রূঢ় অক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আশ-পাশের ঘরে মাতালদের স্খলিতকণ্ঠের চীৎকার তখনো একভাবে শুনা যায়। বসিয়া বসিয়া ভাবি, একদিন সরসীও ঠিক এই ভাবেই রাত্রির সুপ্তিকে হরণ করিয়াছে, অপরের তৃপ্তির জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু যেই তার দেহ সেই দীর্ঘ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বসিল, আর তাহাকে দেখিবার কেহ নাই।

সরসীর সেই অসহায়তায় সেরাত্রে চোখে জল রাখিতে পারি নাই, মনে মনে বলিয়াছিলাম, উহার সহিত প্রবঞ্চনা করিলাম অনেক, কিন্তু আর নয়! বহুপুরুষ মিলিয়া এতদিনে তোমার এবং তোমার রূপের যে লাঞ্ছনা করিয়াছে, আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিব সরসি!

রাত্রি ভোর হইল। স্নান করিয়া আবার আসিব বলিয়া, সরসীর নিকট বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম; কিন্তু স্নান করা হইল না। নীচে হইতেই দেখা গেল শিব বাবুর ঘরের দুয়ারে ছোট খাট একটা ভিড় জমিয়াছে।

শিববাবু তিনদিন পরে এবং কিছুক্ষণ আগে মেসে ফিরিয়াছেন। চেহারা আরও বিশ্রী হইয়াছে, লিভারের ব্যথা বহুদিন হইতেই ছিল সেটাও হঠাৎ অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। ট্রেণে কোথায় যেন গিয়াছিলেন, সঙ্গে বোতলও ছিল,—তাহারি ফলে ষ্টেশনে ট্রেণ সম্পূর্ণ থামিবার পূর্ব্বেই গাড়ি হইতে নামিতে গিয়া নীচে পড়িয়া যান এবং মাথার একদিক বিশেষ ভাবে জখম হয়। কিন্তু ষ্টেশনের লোক কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই, ট্যাক্সি চড়িয়া মেসে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, হাঁসপাতালে যাওয়া হয় নাই।

যখন উপরে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন ম্যানেজার চৌধুরী মশায় শিবসুন্দরের হাত ধরিয়া হাঁসপাতালে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু সে-অনুরোধ রাখিবে কে! শিববাবুর 'না' সহজে 'হাঁ' হইত না, ঐ কথা মেসের সবাই জানে।

ভিড়ের মধ্য দিয়া যখন শিব বাবুর মাথার শিয়রে গিয়া দাঁড়াইলাম, তখনো ক্ষত স্থান দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।

অতিকষ্টে ধীরে ধীরে কহিলেন, চৌধুরী মশাই, মিছে কষ্ট করবেন না, আপনার সাঙ্গোপাঙ্গদের যেতে বলুন, একা এ-ই আমার কাছে বসবে।'—বলিয়া আমাকে দেখাইয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি ঘুমানো হয় নাই, চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছে—কিন্তু শিববাবুর ধ্যান-নিবিড় পাংশু মুখের প্রতি চাহিয়া অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলাম না।

শিববাবু শুধাইলেন, কোথায় ছিলে?

বলিলাম, সরসীর অসুখ, তাই,—বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল! শিববাবু সেটুকু লক্ষ্য করিলেন এবং সহসা মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কথা রাখতে পারো নি, কেমন?

কিন্তু এ-প্রশ্নের মীমাংসা তখনো হয় নাই, নিরুত্তর নত-মুখে বসিয়া রহিলাম।

শিববাবুর কণ্ঠস্বর হঠাৎ ঝাঁঝালো হইয়া উঠিল, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মানুষ কতদিন এই ভুল করবে?

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভুল কিসের?

শিবসুন্দর হঠাৎ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, নিবারণ করিলাম।

বলিলেন, ভুল এই মেয়েদের ভালবাসা। ওরা যে পুরুষের চেয়ে কোনো দিকদিয়ে আশ্চর্য্য বা অদ্ভুত নয়, এই কথাটা আমরা ভুলে যাই। হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়, আর যত অসম্ভব ঐশ্বর্য্য দিয়ে তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিয়ে মনে মনে মহিয়সী করে তুলি। মনে থাকে না যে সংসারে ওদের কেবল দুটি কাজ, এক পরিশ্রম করতে জানা আর সন্তানের জন্ম দেওয়া। অত বড় স্বার্থপর সৃষ্টিতে আর কিছুই নেই। যে বাপ-মা ওদের ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে তোলে, তাদের ছেড়ে নিজের সুখ-সুবিধের জন্যে আর এক জনকে আপনার করে নিতে এদের ক'টা মন্ত্র উচ্চারণের চেয়ে বেশী সময় লাগে না। ঐ জাত যে যে-কোনো মুহূর্ত্তে তোমাকে সরিয়ে দিয়ে আর কারো কণ্ঠলগ্ন হ'বে না, একথা তুমি বলতে পারো?

কিছুই বলিলাম না, কিন্তু রাধাকান্তকে সরসী সেদিন কি ভাবে বিদায় করিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইয়াছিল, সেকথা মনে পড়িল, একদিন আমাকেও যে ঠিক,—

ভাবনার মধ্য-পথেই শিবসুন্দর বলিয়া উঠিলেন, ভাববার কিছু নেই। তুমি ছেলেমানুষ, এই বুড়ো পৃথিবীর ভয়ানক স্বার্থপরতার সঙ্গে এখনো তোমার পরিচয় হয় নি। তোমার আগে আরও কত লোক তার দেহের উত্তাপ মেখে নিজেকে ধন্য মনে করেচে, কত...

বলিলাম, দয়া করে চুপ করুন, সহ্য করতে পারচি না।

—সত্য জিনিষটা সহজে সহ্য হয় না। কিন্তু এ সত্যি। আমি নিজের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে কেবল একটি মাত্র কথা অনুভব করেচি;—ওদের বিধাতা ভালবাসবার শক্তি দেন নি। যেটাকে আমরা ওই নাম দিয়ে কবিতা রচনা করি, সেটা স্বার্থ ছাড়া আর কিছু নয়, সুখ সুবিধা পেলে বনের জানোয়ার বশ হয়, এও ঠিক তাই।

শিবসুন্দর এমন গভীর বিশ্বাসের সহিত সেদিন কথা ক'টা বলিয়াছিলেন যে তার উত্তরে কিছুই বলিতে পারি নাই, সে-শক্তিও ছিল না। অতিরিক্ত কথা বলার পরিশ্রমে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যখন শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইলাম। উপরে আসিয়া দেখি তখনো শিববাবুর ঘুম ভাঙে নাই। বাহির হইলাম সরসীর সহিত দেখা করিতে। কাল রাত্রে যে-কথাটা তড়িৎ-প্রবাহের মত বুকের ভিতর আঘাত করিয়াছিল, আজ দিনের আলোতে তাহার সন্ধানও পাওয়া গেল না। সরসীর বিশুষ্ক মুখ, অবিন্যস্ত চুল, রক্ত-হীন ঠোঁটের দিকে চাহিয়া শিবসুন্দরের কঠিন কথাগুলি মনে পড়িয়া গেল। সরসী আমার চেয়ে বড়, একথা নিজেই স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু কত বড় সেকথা জানা ছিল না। এখন তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সমস্ত শরীর ছোট হইয়া গেল, এই ভাবিয়া যে ইহাকেই আমি সমস্ত দেহ দিয়া স্পর্শ করিয়াছি, চোখে চোখ রাখিয়া, মিথ্যা হইলেও, বলিয়াছি,—তোমায় ভালবাসি!

সরসীর ঘুম ভাঙিয়াছিল, কিন্তু শয্যাত্যাগ করে নাই। দুয়ারের কাছে আমাকে পাথরের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিয়া ম্লান হাসিয়া কহিল, ভারি বিশ্রী দেখাচ্চে, নয় ?

বলিলাম, সত্যি, তুমি যে এত বিশ্রী তা জানতাম না। সরসী সেকথা ঠাট্টা মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিল। তারপর বসিয়া বসিয়া কতক্ষণ কি ভাবিল সেই জানে! উঠিয়া আসিয়া হাতে হাত রাখিয়া কহিল,…কি কর্ব্ব, সত্যি হ'লেও উপায় নেই। কেন তুমি আগে এলে না ?—অনেক আগে,—যেদিন আমি ..

হাসিয়া ফেলিলাম। শান্ত ভাবে হাত টানিয়া লইয়া বলিলাম, মুখ হাত ধুয়ে এসো সরসী, যা রাতের আলোয় শোভন মনে হয়, দিনের আলোয় সব সময় সেগুলো মানায় না।

শিববাবুর একান্ত অসম্মতি সত্বেও ডাক্তার ডাকিয়া আনি। মাথার ক্ষত পরীক্ষা করিয়া এবং বহু প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া ডাক্তার যখন চলিয়া গেলেন, তখন শিববাবুর সে কী উগ্র মূর্ত্তি !

বলিলেন, আমি গরীব, যারা অযাচিত অনুগ্রহে আমার অপমান করতে চায়, তাদের মত আর কাউকে আমি ঘেন্না করতে পারিনে। কে বলেছিল তোমায় ডাক্তার ডেকে পয়সার হারিরলুট দিতে! আমি ইচ্ছে করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম, তা' জানো ?

কি বলিব, অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শিববাবু বলিলেন, আজ চল্লিশ বছর ধরে তিলে তিলে যে অপচয় করেচি, তোমার ডাক্তার এক দিনে তা' উড়িয়ে দেবে! কি জানে ওরা ? ছ' বছরের মধ্যে মানুষের ক'টা ব্যাধির সঙ্গে ওদের পরিচয় হয় ?

শিবসুন্দর অবসন্নের মত পড়িয়া রহিলেন, চোখের কোল দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। সন্ধ্যা হওয়ায় আলো জালিবার উপক্রম করিতেছি, নিষেধ করিলেন। ভয়ে মাথার শিয়রে গিয়া বসি। কতক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটিয়া যায়। শিববাবু যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন! এই অতি জীর্ণ মেসের অন্ধকার ঘর পার হইয়া তাহার জর্জ্জরিত দেহ কোন আলোকিত অলকায় হারাইয়া গেছে!

বহুক্ষণ পরে ছোট টিনের তোরঙটী খুলিয়া ফেলিতে বলিলেন! ভাবিয়াছিলাম হুইস্কির বোতল দেখিব, দেখিলাম খানকয়েক ছবি,—অনেক যত্নে রাখা থাকিলেও বহুদিনের বলিয়া মলিন। এবার নিজেই আলো জালিতে বলিলেন।

ছবি অনেকগুলি, কিন্তু মূর্ত্তি এক—নানা অবস্থার। ভাবিয়াছিলাম, এইবার তিনি দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বিরক্ত করিবেন।

কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সেগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন! একদিন এই রঙ ও রেখার আড়ালে কত কল্পনাই না লুকানো ছিল, আজও যে সেগুলির ওষ্ঠাধরে অসংখ্য চুম্বনের চিহ্ন দেখিলাম, কত নিদ্রাহীন রাত্রে সেইগুলিই হয়ত এই কঙ্কাল-অবশিষ্ট মৃত্যু-তীর্থ-যাত্রীর স্বপ্ন-সাথী হইয়াছিল, আমি তাহার কিছুই জানিলাম না। তবে এইটুকু বুঝিলাম, শিবসুন্দরের সাগরের মত উদার বুক যে ঘৃণায়, পাপে, অবিশ্বাসে সঙ্কীর্ণ ও কুৎসিত করিয়া দিয়াছে, সে হয়ত ওই!

শিববাবু বলিলেন, অনেক দিন আগে আমার ছোট এক ভাই কোথায় যেন পালিয়ে গেচে, আজও ফেরেনি। তোমায় দেখে আমার তার কথা মনে হয়েছিল, নইলে সব কথা তোমায় বলতে পারতাম! কিন্তু, সে বলবার নয়। দেশলাই আছে সঙ্গে ? ওগুলো পুড়িয়ে দাও,—মানুষের অনেক রক্ত ওরা চুষে' খেয়েচে!

রাত্রে আবার ডাক্তার আসিল, ঔষধ ও কোঁড়া ফুঁড়ির অন্ত রহিল না, কিন্তু শিবসুন্দরকে রাখা গেল না। ঘৃণা অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত তাঁহার আত্মা মানুষের স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার অতীত দেশে গিয়া শান্তির অমৃতলাভ করিল কি না, তার উত্তর শুধু মহাকালের কাছে!

শিববাবুর মদের বাকি বিল, ঘর-ভাড়া, আমিই মিটাইলাম, শেষ কাজও করিলাম আমিই, কিন্তু শিবসুন্দরের তাহাতে বোধ করি অপমানই হইল!

সরসীর কাছে সেই হইতে যাই নাই, শিববাবুর সঙ্গে সঙ্গে সে-ইচ্ছাও একেবারে শেষ হইয়া গেল। শিবসুন্দর তাঁহার নিষ্ঠুর মৃত্যু দিয়া চোখের সামনে প্রমাণ করিয়া

গেলেন,—প্রেম মানুষের অন্যায় দুর্ব্বলতা, সেকথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করি! কিন্তু একথা সেদিন একটিবারও ভাবি নাই যে, মৃত্যুর দিন যে স্বার্থসর্ব্বস্ব রমণীর ছবিগুলা তিনি নিজের হাতে ছিঁড়িয়া ছাই করিয়া গেলেন, তাঁহার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিদ্রোহের বুকে সেই নারীর জয়াসনই যে অক্ষয় হইয়া গেলো! শিববাবু তাহাকে অবহেলা করিয়াছিলেন, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন কই? তাঁহার সমস্ত কাঠিন্য ও অবিশ্বাসের নীচে যে স্বচ্ছ সুধা-স্রোত, সেদিন তাহা চোখে পড়ে নাই; ভাবি নাই, যে-ছবি সেদিন ছাই হইয়া গেল, তাহারি সর্ব্বাঙ্গে ছিল শিবসুন্দরের পিপাসাতুর বিবর্ণ ওষ্ঠের আকুল স্পর্শ! নয়ত,—কিন্তু, সে কথা পরে।

শিববাবুর চিকিৎসা ও শেষকৃত্য করিতে এবং দেনা মিটাইতে বেশ কিছু টাকা ব্যয় হইয়া গেল! আমার যেটুকু সম্বল, তার পক্ষে সেগুলি বহন করা উচিত হয় নাই, একথা মানি, কিন্তু মানুষের হৃদয় আর ন্যায়-অন্যায় যে ঠিক এক সাথেই যাওয়া আসা করে, একথা কেমন করিয়া স্বীকার করি?

রাধাকান্ত মনোক্ষোভ মিটাইবার জন্য বহুদিন ধরিয়া আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতে ব্যস্ত আছেন, বুড়া চৌধুরী মশায় নিষ্কাম প্রেমের মহিমা বুঝাইতে গিয়া যখন-তখন অস্থির করিয়া তোলেন,—কিন্তু আর এসবের মধ্যে নয়। শিল্প-চর্চ্চা অনেক হইয়াছে, শেষ-জীবনটা উপবাসে কাটাই-বার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। রাধাকান্ত আবার সরসীর নিকট গিয়া আবেদন-পত্র দাখিল করুক, চৌধুরী মশায়ের ঐশ্বরিক ভালবাসার সাধনা জয়যুক্ত হউক, আর্টিষ্ট-লজে আমার মত আরও বহু হতভাগার সমাবেশ হোক,—আমি চলিলাম!

কোথায়, কিছুই ঠিক ছিল না, পোষ্টাপিসের টাকা ক'টা তুলিয়া লইয়া একদিন ট্রেণে উঠিয়া বসিলাম। কোথাকার কে সরসী, হইলই বা রুগ্ন, পীড়িত, তার জন্য আমার ভাবিয়া লাভ কি? শুশ্রূষার লোক দুই দিন পরেই যে-হয় একজন জুটিয়া যাইবে। আমার অপরিচিত একটি মেয়ে শিববাবুকে যে-ভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে পৌঁছাইয়া দিল, তাহার তুলনায় আমার সরসীকে ছাড়িয়া আসা কতটুকু?

সরসীর বাসা এবং আর্টিষ্ট-লজ হইতে দেড়শ' মাইল দূরে যে ধর্ম্ম-শালায় আশ্রয় লইলাম, তাহারই কিছু দূরে প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। দূর হইতে দেখা যায়, চিম্‌নির কালি কেমন করিয়া প্রভাত-আকাশ কলঙ্কে কালো করিয়া দেয়,—ফার্ণেস-বয়লারের আগুনের আলো রাত্রির অন্ধকারকে কোন্ মন্ত্রে যক্ষপুরীর মত স্বর্ণাভ করিয়া তোলে!

ইচ্ছা ছিল এবার সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার হাত হইতে একে-বারেই নিষ্কৃতি লইব, পশুর মত খাটিয়া কপালের স্বেদ-বিন্দুর মূল্যে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টা করিব। 'এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোয়' নাম লিখাইয়া দিলাম। ধর্ম্মশালায় আট দিনের বেশী থাকিতে দেয় না, না দিক্, এই কয় দিনের মধ্যে কাজ একটা জুটিয়া যাইবে, এইরূপ আশা পাওয়া গেল।

সেদিন রাত্রিতে ধর্ম্মশালার ছোট কুঠরীতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সরসীকে চিঠি লিখিয়া বসিলাম। এই অস্থায়ী বাসস্থানের ঠিকানাও একটা দিলাম ঐ সঙ্গে।

লিখিলাম,—

'তোমার শরীর সুস্থ নয় দেখিয়া আসিয়াছি, আশা করি এখন সুস্থ ও সবল হইয়াছ। কি জন্য এত দূরদেশে আসিয়া পড়িলাম, সেকথা শুনিবার আবশ্যকতা তোমার নাই। বেচারী রাধাকান্তকে বিদায় দিয়া আমাকে কাছে টানিয়া লইতে তোমার খুব বেশী সময় লাগে নাই। আমি স্বেচ্ছায় তোমার পথ হইতে সরিয়া আসার পর এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আর একজন প্রেমাস্পদ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছ। তোমার দিন সুখেই কাটিবে।…'

আর যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা না উল্লেখ করিলে ক্ষতি নাই।

চিঠি লিখিয়া নিষ্ঠুর আহ্লাদে খুসী হইয়া উঠিলাম; ভাবিলাম, স্বর্গ—অবশ্য যদি থাকে, তবে সেখান হইতে শিবসুন্দরের আত্মা নিশ্চয়ই আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে!

তিন দিন ধর্ম্মশালায় কাটিয়া গেল।

দু'পহরে কোন কাজ না থাকায় কারখানায় বেড়াইতে

যাই, গলানো লোহার গাদ জমিয়া কারখার চতুর্দ্দিকে যেন পাহাড় তৈয়ারী হইয়াছে। এই বিচিত্র বিংশ শতাব্দীতে মানুষকেও আমরা যন্ত্রে পরিণত করিয়াছি এ' কথা এই যন্ত্র পুরীর মধ্যে পা দিবার পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। রূপকথার দৈত্যের মত মাথার উপরে, পায়ের নীচে, দুই পাশে কলের চাকা গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে—আর সেগুলির সঙ্গে, ঠিক যেন পাল্লা দিয়া অর্দ্ধনগ্ন, কালি-মাখা, উপবাসী নর-নারীর সে কি অবিশ্রাম খাটুনি! সেদিন একটু অন্যমনস্কের মত চলিয়াছি, 'এলার্ম বেলের' শব্দ কাণে পৌঁছে নাই, উপরে দৃষ্টি পড়িতেই দেখি প্রকাণ্ড এক রক্তবর্ণ লোহার টুকরা মাথার উপর দিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে চলিয়াছে, তারটি ছিঁড়িয়া গেলেই নর-জন্মের পরিসমাপ্তি!

আর একদিন,—কারখানার মধ্যেই, মালগাড়ী চাপা পড়িতে পড়িতে দৈবাৎ প্রাণটুকু ফিরিয়া পাইলাম। আরও শোনা গেল, কারখানার ইতিহাসে নাকি এমন একটি দিনও নাই, যেদিন একটা-না-একটা মানুষ হাত-পা না হারাইয়াছে, বা পুরোপুরি প্রাণটাই না দিয়াছে! ভাগ্যে গলানো লোহার সহিত মানুষের তাজা রক্ত মিশ খাইয়া যায়, তাই রক্ষা!

দেখিয়া দেখিয়া দম বন্ধ হইয়া আসে! আজিকার এই সুনবীন সভ্যতার লৌহপাশ হইতে অথর্ব্ব পৃথিবী কতদিনে মুক্তি পাইবে কে জানে?

কারখানার অদ্ভুত কর্ম্মচক্রের সহিত পরিচয় স্থাপিত হইবার পর সমস্ত দেহ-মন যখন পলাইবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সরসীর টেলিগ্রাম! ব্যারাম কঠিন, শেষবারের মত দেখা করিতে চাহে!

অন্য সময় হাসিয়া অস্থির হইতাম, কিন্তু সেদিন হাসা হইল না। এখানকার বসবাস ত' আর দুই দিন পরেই উঠাইতে হইত, আজই যাওয়া যাক। এই হৃদয়হীন যক্ষ পুরীতে হাতুড়ি পিটিয়া পয়সা রোজগার করা অপেক্ষা, সরসীর সহিত দেখা করিতে যাওয়া ঢের সহজ! রাত্রির পূর্ব্ব আকাশ তখন বয়লারের আভায় ভোরের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। সুট্-কেশটা গুছাইয়া লইয়া ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সারারাত্রি ট্রেণে জাগিয়া কাটিল। পুরাণো এবং পরিচিত সহরের মাটীতে এক সপ্তাহ পরে আবার যখন পা' দিলাম,—তখন ভোর হইয়াছে। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখি, সুট্-কেশটি ভুলিয়া আসিয়াছি। সুট-কেশটিই যথাসর্ব্বস্ব,—পুঁজির টাকা-কড়ি পর্য্যন্ত তাহাতেই! ছুটলাম গাড়ীর দিকে, কিন্তু প্রত্যেকটি কামরা তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা সত্বেও সুটকেসের চিহ্ন দেখা গেল না। সেই চঞ্চল জন-সমুদ্রের মধ্যে কাহার হাতে গিয়া উঠিয়াছে কে জানে! যাক, আমার চেয়েও কোনো হতভাগার হয়ত প্রয়োজন ছিল।

সরসীর কাছে চলিয়াছি, কিছুদিনের মত আশ্রয়ের অভাব হইবে না, এ'কথা জানিতাম। কিন্তু, তারপর?

জীবনের পথ চলিতে চলিতে সেই প্রথম কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিতে শিখিলাম। শিল্প-চর্চ্চা এবং শ্রমিক-গিরি, দুই হইয়া গেছে; অতঃপর? কিন্তু! ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতেই রহিল, খুব বেশীক্ষণ ভাবা চলিল না। টিকিটের জন্য কাল রাত্রে একখানা নোট ভাঙ্গাইতে হইয়াছে, বাকি ক'টা টাকা পকেটে ছিল, তাই রক্ষা!

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ট্যাক্সিতেই উঠিতে হইল।

সেইমাত্র স্নান শেষ করিয়া উঠিয়াছে, রোগ বালাইয়ের চিহ্ন মাত্র নাই! সরসী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিল!

কহিল, কেমন ভয় দেখালাম বলো ত! চিঠিতে কি সব মাথা-মুণ্ড লেখা হয়েছিল শুনি?

বলা বাহুল্য, সরসীর মত উল্লাস বোধ করিতে পারিলাম না। সরসী যদি মিথ্যা অসুখের সংবাদ দিয়া টেলিগ্রাম না করিত, তবে আজ আমাকে নিঃসম্বল হইতে হইত না, এই কথাটাই বারংবার মনে পড়িল।

বলিলাম, মানুষের ছল-চাতুরীর সীমা আছে সরসী।

কী দরকার ছিল তোমার এমনি করে,—

সরসীর চাপল্য ঘুচিয়া গেল। অপরাধীর মতো মাথা নীচু করিয়া বলিল, বিশ্বাস করো; এর মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। যদি জানতাম এতে তোমার ক্ষতি হ'বে তা' হ'লে,—

কিন্তু সেকথা বিশ্বাসের সময় তখন নয়। মুখে যা আসিল তাই বলিয়া সরসীকে দোষ দিলাম। সরসী অনুযোগ করিল না, প্রত্যুত্তরে একটা কথা বলিল না, হাত ধরিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, লক্ষীটি রাগ করো না, এতদুর আমি ভাবি নি। কিন্তু, সত্যিই যদি তোমার ক্ষতি কিছু হয়ে থাকে, আমি তা' পুরণ করব। ঘরে চলো।

সমস্ত কথা শুনিলে সরসী যে তাহাকে বিদায় দিতে ইতস্ততঃ করিবে না, সে-সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসন্দেহই ছিলাম সুতরাং, ঘরে না গিয়া লাভ কি ?

ষ্টোভ জালিয়া সরসী নিজের হাতে চা ও লুচি তৈয়ারী করিল। লুচির থালা সম্মুখে আনিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল; কহিল, একটা কথা বলব, রাগ করবে না ?

কি কথা, না শুনে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না।

আমি খাইয়ে দিই ?

আমায় ? কেন, এখনো ত' হাত-পা কাটা পড়ে নি।

তা নয়, যদি বলো,—

সত্যিই সেদিন ছোট ছেলেটির মত সরসীর হাতে খাইতে হইল।

একসময়ে তাহার ডান হাতের বিশেষ একটা স্থানে দৃষ্টি পড়িতেই দেখি সেখানে উল্কির অক্ষরে আমার নাম! যদিও আমার যথার্থ নাম নয় তবু বলিলাম, ও আবার কি ছেলেমানুষী ?

সরসী কথা কহিল না, ছেলেমানুষের মত লজ্জায় মাথা নীচু করিল। আমার পক্ষে সেটা অসীম গৌরব বোধের অবসর, কিন্তু মনের অবস্থা তাহার উপযোগী নয়, চুপ করিয়া রহিলাম।

সরসী কহিল, কি জন্যে অতদূর গিয়েছিলে সেকথা বললে না ?

একথা সরসীর কাছে কিছুতেই স্বীকার করা চলে না যে, উদ্দেশ্য না থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম চাকুরীর চেষ্টায় এবং ফিরিবার বেলায় সর্ব্বস্ব ট্রেণেই রাখিয়া আসিয়াছি।

বলিলাম, শরীর ভাল নয়, তাই হাওয়া বদলাতে—

সরসীর চোখমুখ হঠাৎ আশঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল। কাছে আসিয়া কহিল, কি হয়েছিল ? কিন্তু সেকথা ত' চিঠিতে—

দরকার নেই ভেবে লিখি নি। অসুখ নিতান্ত সোজাও নয়, বা দিকের পাঁজরের কাছে···

সরসীর দু'চোখ বাহিয়া নিঃশব্দে জল বাহিয়া আসিল। কহিল, চিঠিতে একথা জানাওনি বলে রাগ করা আমার উচিত ছিল, কিন্তু এই রুগ্ন শরীর নিয়েও তুমি ছুটে এসেচো দেখা করতে...কেমন ক'রে তোমার উপর রাগ করি ? কিন্তু সত্যি বলচি এমনি করে নিজের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তুমি পাবে না। সঙ্গে কোনো জিনিষপত্র না নিয়ে কেন এমন করে আসতে গেলে ?

তোমার অসুখের কথা শুনে' যে-অবস্থায় ছিলাম, সেই ভাবেই,—সরসীর বুক গর্ব্বে নিশ্চয় সেদিন ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি তাকে সে-গৌরববোধের সুযোগ দিবার জন্য ও-কথা বলি নাই।

সরসী কহিল, কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি, তাই শুধু ভাবচি! আমি হাতে তোমার নাম লিখেচি, সেইটেই হ'ল ছেলেমানুষী, আর তুমি যে এমনি ক'রে আমার জন্যে...

আবার তার সেই উচ্ছ্বসিত কান্না।

একটু থামিয়া সরসী পুনশ্চ বলিতে লাগিল, কেন তুমি আমার জন্যে সারারাত্রি জেগে, ঠাণ্ডা লাগিয়ে...ছি, ছি! আমি তোমার কে ? তোমার জন্যে কতটুকু আমি করতে পারি ?

সরসীর কথা ও কান্না সেদিন যে ঠিক বিশ্বাস করিয়াছিলাম, একথা বলিতে পারি না, কিন্তু কত বড় মিথ্যাকে সে কত বড় সত্য মনে করিয়া গর্ব্ব ও আশঙ্কা

বোধ করিতেছে, সেকথা মনে করিয়া বোধ করি একটু লজ্জা হইয়াছিল।

সরসী উঠিয়া-পড়িয়া রোগের উদ্যারক করিতে লাগিয়া গেল। আমার সামান্যতম অসুবিধা দূর করিবার জন্য বেচারী এমনি অসামান্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল যে, দুই দিনেই অসহ্য হইয়া উঠিল! ডাক্তার আসিলে পাছে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণ হইয়া যায়, সেজন্য অতি কষ্টে সরসীর সে-চেষ্টা নিবারণ করিলাম। আর কোন ত্রুটি রহিল না।

সরসী বিলাসে বাড়িয়াছে, নিজের হাতে রান্না করা তা'র অভ্যাস নয়, রাত্রির পর রাত্রি মদে ডুবিয়া কাটাইয়া দিয়াছে; কিন্তু আমার জন্য সরসী আজ মদ জিনিষটার কথাই ভুলিয়া গেল, আমার আহার্য্যের অতি তুচ্ছ জিনিষটুকুও অতিযত্নে নিজেই পাক করিতে লাগিল এবং অবহেলা অনাদরে তাহার সমস্ত শরীর রুগ্ন ও মলিন হইয়া গেল—শুকানো ফুলের মত!

সেদিন সরসীকে বলিলাম, সঙ্গে আমি কিছুই নিয়ে আসতে পারিনি, হঠাৎ—, কিন্তু আর নয়। এবার সেখানে গিয়ে সেগুলোর ব্যবস্থা করে আসতে দাও।

সেগুলির ব্যবস্থা এখানে বসিয়াও করা চলিত, কিন্তু সে-সম্বন্ধে সরসীর মনে সন্দেহ জাগিবার মত বুদ্ধি নাই, একথা জানিতাম।

সরসী কহিল, না, না,—টাকা যেখানে আছে, সেই খানেই থাক, তোমার এই রোগা শরীর নিয়ে কিছুতেই যাওয়া হ'বে না।

নিশ্চিন্ত হইলাম।

এক সপ্তাহ সরসীর সেই ঘরের মধ্যে! বাহিরের আকাশ ভুলিয়া গেলাম,—সরসী উঠিতে পর্য্যন্ত দেয় না। কল্পিত রোগ-শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া শুনি, প্রার্থীদল সরসীর দুয়ারের বাহির হইতে ফিরিয়া যায়। কিন্তু ক্রমাগত সেবা ভোগ করিতে করিতে বাস্তবিক লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু সরসীর এই সেবা ও আত্ম-অস্বীকার, একি এ—?

শিবসুন্দরের মাংস-অস্থি একদিন আমিই চিতায় জ্বালাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার মধ্যে তখনো তিনি মরেন নাই। তাই সরসীর যা-কিছু সমস্ত আচরণকে প্রকাণ্ড জাল-বিস্তার ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারি না। যে-বাড়ীর চব্বিশটি ঘরে ঘণ্টায় ঘণ্টায় মানুষের মর্ম্মকোষ লইয়া রক্তারক্তি চলিয়াছে সেখানে বসিয়া কেমন করিয়া বিশ্বাস করি, ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও সরসী ইহাদের গোত্র ছাড়া, আর শিববাবুর সমস্ত জীবন দিয়া অনুভব করা সে কথা, মিথ্যা, ভুল, ফাঁকি?

কিন্তু সহরের বাহিরে গিয়া পড়িলাম।

সরসীর সমস্ত আচরণ যত বড় বদর্থ হইয়াই আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠুক, আমি তাহার কাছে কিছুতেই আসল কথাটা স্বীকার করিতে পারি না। কতবার কত কত রকমে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সরসীর অদ্ভুত ও একাগ্র চোখ দুটির সম্মুখে ঐকথা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিলাম না যে, আমার বাপ নাই, মা নাই ভাই-বোন কেহ নাই। এতবড় পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা অসহায় এবং আজ একটা কাণা কড়িও আমার সম্বল নাই। নিজের এতবড় দৈন্যের কথা নিজের মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করি! কেমন করিয়া বলি, পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ মানুষের মত আমিও নীরোগ, কিন্তু পরিশ্রমের মূল্যে পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আমার নাই, তুলি ধরিতে শিখিয়াছি, হাতুড়ী পিটিবার হাত আমার ভাঙিয়া গেছে, আর আমার যে-নাম তোমার রক্তের সঙ্গে দক্ষিণ হাতে চিরকালের মত লেখা, সে আমার নাম-ই নয়, নিতান্ত মিথ্যা কল্পনা,......?

সেদিন সরসীকে বলিলাম, কিছু রং, তুলি, কাগজ অনিয়ে দিতে পারো? সরসী বলিল, না। ছবি আঁকা এ শরীরে সহ্য হ'বে না। ভাবিয়াছিলাম, ছবি আঁকিয়া,—সম্ভব হইলে, কিছু টাকা আনিবার ব্যবস্থা করিব। সরসীর আপত্তিতে সে-আশা মনের মধ্যে মরিয়া গেল, বিরক্তি বোধ করিলাম যথেষ্ট, কিন্তু বলিবার কি ছিল! মুখভার

করিয়া পড়িয়া রহিলাম ওই-টুকুই পারিতাম। কিন্তু সন্ধ্যার পর সব কিছুই আসিয়া পৌঁছিল।

সমস্ত দিন ধরিয়া কাগজের বুকে রং ও রেখা দিয়া ছবি আঁকি। সরসীর ছবি,—বহুদিন আগে হঠাৎ এক দিন নিশীথ-আলোকে সরসীর রোগশয্যালীন ঘুমন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সেকথা মনে হইয়াছিল। কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাস বশতঃ অনাবশ্যক বিলম্ব হইতে থাকে। ছবি তখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সরসী একদিন পাশে আসিয়া বসিল এবং বলিল, তুমি যে চুপি চুপি আমারি ছবি আঁকবে এ'কথা জানলে আমি,—

সে কথা জানিলে সরসী কি করিত, তা সেই জানে, কিন্তু বলিতে বলিতে তাহার পাংশু ওষ্ঠাধরে আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল. সেটা লক্ষ্য করিলাম। সরসী নিশ্চয়ই এটাকে তাহার প্রতি আমার বিপুল প্রেমের নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়াছে!

ছবি আঁকিতে আঁকিতেই এক একদিন শুনিতে পাই, ঘরের বাহিরে সরসীর সহবাসিনীগণ তাহাকে লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে! কিন্তু সরসীর মুখে কথা নাই।

একদিন কাহাকে বলিতে শুনিলাম, ইদিকে দু'মাসের ভাড়া বাকি তা' মনে আছে? ঘরে ত' আর কাউকে ঢুকতেও দিবি নি, কিন্তু মুখে মুখ দিয়ে আর কদিন কার পেট ভরে বাছা!

হাতের তুলি থামিয়া গেল।

সরসী কোথা হইতে, কেমন করিয়া ব্যয়-নির্ব্বাহ করিতেছে, সেকথা ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়া দেখি নাই, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু সেদিন নিজের উপর সত্যই ঘৃণা হইয়াছিল।

সরসী যখন ঘরে ঢুকিল, তখন তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, দু'মাসের ঘরভাড়া বাকি, এ'কথা আমায় বলো নি কেন সরসী?

তা' হ'লে তুমি একদিনও এখানে থাকতে?

বোধ হয় না। ঠিক জানি না! কিন্তু তোমার এ টাকা ক'টা আমি দেবো।

কোথায় পাবে?

ছবি বিক্রী করিয়া টাকা আনিব, এ' কথা কেমন করিয়া বলা যায়?

বলিলাম, যদিও বাবা খোঁজ খবর নেন না, কিন্তু আজও তাঁর নাম করলে তাঁর ছেলেকে কেউ যে দু'পাঁচশো ছেড়ে দিয়ে ভয় পাবে না, এ' ঠিক। তোমার টাকা আমি দেব।

সরসী চুপ করিয়া রহিল।

শিল্প-বিদ্যালয়ে বিক্রয়ের জন্য ছবিখানি দিতে গিয়া দেখি, চৌধুরী মশায়! মোটা মাহিনায় মাষ্টারী করিতেছেন, মেলা শিষ্য-সন্ততি!

দেখা হইতেই পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, আরে এস, এস! অনেক দিন পরে দেখা! তারপর আছো কোথায়? হ্যাঁ, 'আর্টিষ্টস্ লজ' উঠে গেছে, শোনো নি বোধহয়? এই তোমরা গেলে, তার কিছুদিন পরেই আর কি! না, মিনি পয়সায় ক'দিন মেস চালানো যায়! কোনো ব্যাটা পয়সা ঠেকাবে না! তারপর, হঠাৎ এদিকে যে? পোর্ট্রেট পেন্টিঙে তোমার খাসা হাত ছিল, কিছু করুচ না?

যাহা করিতেছি, তাহা বলিবার নয়। শুধু যে উদ্দেশ্যে হঠাৎ এদিকে আসিয়াছি, সেইটা কোনমতে বলিয়া ফেলিলাম। ছবি দেখিয়া চৌধুরী বলিলেন, খাসা হয়েচে, চমৎকার হয়েচে, এ'ছবি দু'শো টাকার কম কিছুতেই ছাড়া হ'বে না। এক হপ্তার মধ্যেই বিক্রী হয়ে যাবে। আমি ত' বলেছিলাম, তুমি একটি প্রতিভা! কিন্তু, আজ আর দেরী করবার সময় নেই। রবিবার কিম্বা শনিবার, ৬নং ফাল্গুন চাটুয্যের লেনে—

হ্যাঁ, সেইখানেই সব কথা হ'বে। আর হ্যাঁ, শুনেচো, সেই মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেচে।

কবে?

সময় নেই। সেসব কথা শনিবার, কিম্বা—

ফিরিয়া আসিয়া সরসীকে বলিলাম, সপ্তাহের মধ্যেই তোমায় টাকাটা দিতে পারবো।

কিন্তু ছয়দিন কাটিয়া যাওয়া সত্বেও ছবি বিক্রীর কোন ব্যবস্থা হইল না। চৌধুরীর চোখ দিয়া সবাই যে আমার ছবি বিচার করিয়া দেখিবে, এমন কি কথা আছে?

বাড়ীর অধিকারিণী নিত্য তাগাদা দিয়া যায়, কিন্তু সরসী ঐ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। তুচ্ছ ঐক'টা টাকা যে আমি দিতে পারিব, সে-বিষয়ে সরসী নিঃসংশয়।

মধ্যে মধ্যে বলিত, ঘরের ভাড়া মিটে গেলে আমি কি করবো জানো?

না, শুনি।

এই নোংরা বাড়ী ছেড়ে সেই-দিনই উঠে যাবো। আমি ঘর দেখে এসেচি। দক্ষিণ দুয়োরি ঘর, পশ্চিম দিকে জানালা, বিছানা থেকেই দু'জনে দেখব, কেমন করে গ্যাসের আলো নিভে গিয়ে আস্তে আস্তে ভোর হয়।

হুঁ।

ভাড়া এর চেয়ে কিছু বেশী। তা' হ'ক। তোমার শরীর ভাল নয়, ঘরে হাওয়া একটু চাই, আলো-ও। নতুন বাড়ীতে গিয়ে সুরু হ'বে নতুন সংসার, বুঝ্‌লেন মশাই! তাড়া-তাড়ি সেরে উঠুন।

সরসী হঠাৎ যেন তার হারাণো কৈশোরলোকে ফিরিয়া গেছে!

আচ্ছা, সমস্ত দিন দু'জনে কি করবো বলো দিকি? আমি ইংরিজী জানি না, তুমি শিখিয়ে দেবে বুঝলে? তুমি গুরু-মশাই, আমি সর্দ্দার পোড়ো। আমাদের গাঁয়ে এক-চোক কাণা এক পণ্ডিত ছিল, ছেলেবেলায় কতদিন তার পৈতে ছিঁড়ে দিয়েচি,...উঃ, তখন সে কি মজাই হ'ত! ভাল করে যদি পড়াতে না পারো তা' হলে তোমারো অবস্থা সেই রকম হ'বে!

তারপর আরও কত অসংলগ্ন, অর্থহীন কথা!

মনে সবই থাকে, —আছে-ও, কিন্তু হয় নাই কিছুই।

শিববাবু আমার মধ্যে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, একদিন তেমনি হঠাৎ আবার জাগিয়া উঠিলেন। সরসীর অজস্র-কল্পনা ভোরের তারার মত দৃষ্টির অগোচরে গিয়া মুখ ঢাকিল। আরও একটি বাসন্তী ফুল অকাল-বৈশাখী হাওয়ায় উড়িয়া, ছিঁড়িয়া গেল। সাত-দিনের দিনও ছবি বিক্রীর কোন আশাই পাওয়া গেল না।

সরসী জিজ্ঞাসা করিল, টাকার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম কিনা। ইহাই এ-সম্বন্ধে তাহার প্রথম প্রশ্ন।

টাকার প্রয়োজন যে তাহার কত বেশী, সেকথা জানিতাম, কিন্তু আজই সরসী বাড়ীর অধিকারিণীকে ভাড়া মিটাইয়া দিবে বলিয়াছে এবং কাল আমরা নূতন বাটীতে উঠিয়া যাইব। নিজের শেষ দুই-টি টাকা দিয়া সরসী ঘর খানার বায়না পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছে। কথাগুলি মনে পড়িল এবং তাহার ফলে টাকার ব্যবস্থা যে কিছুই হয় নাই সেকথা সরসীকে বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, আজকের রাতটি কোনমতে চুপ করে থাক, কাল সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যার কাছে টাকাটা চেয়েচি, তার বাড়ীতে একটু গোলোযোগ যাচ্ছে, নইলে—

রাত্রি তখন দশটা। আশ-পাশের ঘরে মাতালদের হট্ট-গোল এবং মেয়েদের সঙ্গীতের নামে চীৎকার,—দুই সপ্তম পর্দ্দে পৌঁছিয়াছে।

নূতন বাড়ীতে যাইবার জন্য সরসী খুচরা জিনিষগুলি গুছাইতে ব্যস্ত, হঠাৎ, দুয়ারে করাঘাত।

সরসী বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতেই দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। উঠিয়া দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত গেলাম। যতদূর বুঝিলাম রাধাকান্ত; কিন্তু কথাবার্ত্তার কিছুই স্পষ্ট কাণে গেল না।

সরসী যখন ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার নিজের কাজে মন দিল, তখন আমার সমস্ত মন সন্দেহ ও সংশয়ে পরিপূর্ণ। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকটি কে?

সরসী হাসিল। কহিল, তোমার শোনবার দরকার নেই!

আছে।

ছেলেমানুষী করো না, হাত ছাড়। কাল সকালেই জিনিষ-পত্তর ও-বাড়ী চালান দিতে হ'বে।

কিন্তু কে এসেছিল, সে কথা শুনতে চাই।

সরসী এক মুহূর্ত্ত বিস্মিতের মত মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আজও যদি এই রকম করে জবাব-দিহি

করতে হয়, তবে তার মত লজ্জার কথা আর নেই বিভাস। যে এসেছিল, সে তোমার গুরু, রাধাকান্ত।

কি করতে এসেছিল শুনি?

সেকথা না-ই বা শুনলে?

হ্যাঁ, শুনব।

মানুষ কি করতে এখানে আসে?

সম্মুখে আয়না ছিল না, নতুবা নিজের মুখের ভাবটা সে-সময়ে দেখিয়া লইতাম। কদর্য্য ঈর্ষ্যায় সমস্ত মুখ বাঁকিয়া গিয়াছিল। বলিলাম, ও! আমাদের মত বোকা সংসারে আজও ঢের আছে, তাই তোমাদের—

সরসী প্রত্যুত্তরে একটি কথাও কহিল না, শুধু চোখ দুটি একবার অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিল! তারপর নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও সঙ্গে আসিলাম। সরসীর দুই হাত মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিলাম, রাধাকান্ত কি করতে এসেছিল, সে কথা না শুনলে আমি ছাড়বো না।

সরসী সোজা হইয়া দাঁড়াইল, চোখের উপর চোখ রাখিয়া সহজ, সতেজকণ্ঠে উত্তর দিল, তোমার যা ইচ্ছে তাই ভাবতে পারো, কিন্তু সে-কথার উত্তর তুমি পাবে না। আমি এত ছোট নই!

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সরসীর দুই চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল আমার হাতের উপর পড়িল। কিন্তু সেদিন সেটাকে অকৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করি নাই। কারণ সে অশ্রুর উৎস কোথায়— সেকথা জানিতাম না।

আবার সেই সংশয় ও সন্দেহের দেশে ফিরিয়া গেলাম, —শিববাবু যে-দেশের রাজা। সরসী প্রতিদিনের মত পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু অসহ্য ঘৃণায় তাহার প্রতি চাহিতে পারিলাম না। এতদিন তাহারি আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে কাটাইতে হইয়াছে, সেকথা মনে পড়িতে, ইচ্ছা হইল গলা টিপিয়া চিরকালের মত সরসীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দিই। সরসী কোন কথা কহিল না, পাশ ফিরিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

রাত্রি শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভোর হয় নাই।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সরসী ঘুমাইয়া আছে। অন্ধকারে হঠাৎ গায়ে হাত লাগিতে বুঝিলাম প্রগাঢ় জ্বরে সরসীর সর্ব্ব শরীর পুড়িয়া যাইতেছে। আলো জ্বালিলাম। গালের উপর শুকানো কান্নার চিহ্ন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতক্ষণ আগে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কে জানে!

কিন্তু তা'র জন্য দুঃখ হয় না। কান্না যে রাধাকান্তর জন্য সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

ভুলিয়া গেলাম, আর কিছুক্ষণ পরেই সরসীকে টাকা আনিয়া দিব বলিয়াছি, আজই সরসী নতুন বাড়ীতে জিনিষ পত্তর চালান দিবে! কেবল একটি কথাই সেই প্রত্যুষালোকে আমার সমস্ত পৃথিবীকে কদর্য্য ও কুৎসিত করিয়া তুলিল, 'নারীর হৃদয় নাই।'

জ্বর বিরামের পূর্ব্বে সরসীর ঘুম ভাঙ্গিবে না, জানিতাম। সুতরাং তাহাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া নীচে নামিলাম। রাত্রির উদ্দাম বিভৎসতার শেষে ভোরাই হাওয়ায় সবাই ঘুমন্ত। ঘুমাক্, ভালই!

পথে নামিয়া পড়িলাম।

তারপর কতদিন পথে পথে কাটিয়া গেল, কিন্তু কি করিয়া কাটিল, সেটা এ-গল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ছ'মাস পরে সরসীকে যে-চিঠিখানি লিখি, সেইটাই এখানে তুলিয়া দিই।

"...এতদিন পরে হঠাৎ কেন যে তোমায় চিঠি লিখিতে বসিলাম, সেটা তোমার নিকট যেমন আশ্চর্য্যের, আমার নিকটেও তাই। তবু লিখিলাম। যদিও না লিখিলে কোন গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।

প্রথমেই যে-কথাটি বলা প্রয়োজন, সেইটাই বলি। তোমার কাছে নিজের সম্বন্ধে যে-পরিচয় দিয়াছি, সেটা আদ্যন্ত মিথ্যা। যে-নামে আমি তোমার কাছে পরিচিত সেইটাই যে সত্য, তা-ও বা কেমন করিয়া বলি? যেদিন তোমার সহিত পরিচয় হয় এবং যেদিন সে-পরিচয় তোমার অগোচরে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া আসি, সেদিন এ'কথা ভাবি নাই যে, বহুদিন তোমার কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে, বা

ছ'মাস পরে আবার একদিন তোমায় চিঠি লিখিতে বসিব।

মানুষের মত বাঁচিবার সাধ একদিন আমারও ছিল। যেদিন পবিত্রতা, দয়া ও স্নেহ দিয়া কল্পনার একটি কল্পলোক সৃষ্টি করিয়াছিলাম, আকাশকে আত্মীয়ের মত পরিচিত মনে হইত, কিন্তু তুমি সেসব বুঝিবে না।

সেই ধ্যানের পৃথিবী কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল,—রসাতলে নামিয়া সেই কথাই লিখিব।"

কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল সেকথা সরসীকে জানাইয়া লিখিয়াছিলাম,—

'আজ শিববাবু নাই, আর্টিষ্টলজও কলিকাতা সহরে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। আজ যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে টুটি টিপিয়া আমিই হয়ত তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতাম, কিন্তু তিনি নাই। কত বড় ভুল ধারণায় তিনি পৃথিবীকে কলুষিত করিয়া গেলেন, সেকথা যদি তাঁহাকে জানাইবার উপায় থাকিত! কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিলাম, সেই কথাটি তোমাকে খুলিয়া বলা আবশ্যক।

আমাদের আর্টিষ্ট লজে চৌধুরী মশায় বলিয়া একজন বুড়া ভদ্রলোক বাস করিতেন। আজ তিনি নামজাদা শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিন্তু সেদিন মেস-শুদ্ধ সবাই তাঁহাকে কেবল পরিহাসই করিত। জ্বরের ঘোরে তোমাকে ছাড়িয়া আসিবার অনেক দিন,—বোধ হয় ছ'মাস পরে, এক রাত্রে কোন পার্কের বেঞ্চে তাঁহার সহিত দেখা হইয়া গেল। তোমার যে-ছবিটি আঁকিয়া বিক্রী করিতে দিয়াছিলাম, সেটি, এতদিন পরে নাকি সত্যই কে কিনিয়া লইয়াছে, একশ' পঁচাত্তর টাকায়; চৌধুরী মশায়ের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল। কারণ, ইতিমধ্যে ও-খানির খোঁজ খবর আর করি নাই।

মানুষের মনে এক একদিন এমন একটি মুহূর্ত্ত আসে, যখন নিজের কথা অপরকে খুলিয়া বলিতে পারিলে যেন মুক্তি পাওয়া যায়। তেমনি একটি মুহূর্ত্তে চৌধুরী ম'শায় আমার জীবনের আখ্যায়িকাটি আদ্যন্ত শুনিয়া লইলেন। তখন পার্কে লোকজন বড় একটা নাই, অস্পষ্ট কুয়াসার মধ্যে দূরে এবং নিকটে গ্যাসের আলোগুলি জ্বলিতেছে।

চৌধুরী ম'শায় বলিলেন 'সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ পরিপূর্ণতার খোঁজে বেরিয়েচে, কিন্তু পায়নি, বোধ করি তা' নেই। এরি জন্যে ক্যাটো করেচে আত্ম-হত্যা, খৃষ্টানরা একদিন সিংহের মুখে নিজেদের নিবেদন করে দিয়েচে। তবু তা সম্ভব হয়নি। পরিপূর্ণ প্রেম বিধাতার সৃষ্টির কল্পনার চেয়ে অনেক বড়। আজ তা' নেই। কিন্তু তাই বো'লে ও-জিনিষটার অস্তিত্বই অস্বীকার করি কেমন করে? সরসী কেন তোমাকে শেষ দিন রাধাকান্তর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে চায়নি, তা' বলতে পারি না. কিন্তু তবু সে তোমাকেই চেয়েছিল এবং আজও হয়ত চেয়েই আছে। তোমার কল্পিত ব্যায়রামের সময় সেই মেয়েটী তোমার জন্যে যতটুকু করেচে, তা'-ও না করলে কেউ তাকে ফাঁসি দিতে যেত না, তবু সে করেচে; তুমি তা'র কতটুকু দান দিয়ে এলে? মনে করো, জ্বর বিরামের পর সরসীর সে কি দুরবস্থা! ছ'মাসের ঘর ভাড়া বাকি, বাড়া-অলির তাগাদা, সঙ্গিনীদের ঠাট্টা, এদিকে তার শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত সে তোমার জন্যে খরচ করেচে; সেদিন অসুখের দুধ কেনবার পয়সাও তার নেই! নারীকে আমরা দেবীর মূর্ত্তিতে দেখতে চাই, কিন্তু সে মূর্ত্তিকে ভাঙ্গে কে? তা'র পূজার ডালা তোমাদেরি পায়ের আঘাতে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, আবার তোমরাই কর তারস্বরে পরিপূর্ণতার জন্যে চীৎকার!' চৌধুরী ঠিক এক সঙ্গেই এতগুলি কথা বলে নাই, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়া বক্তব্য সপ্রমাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে অভিজ্ঞতার কথা তোমার জানা আবশ্যক নয়।

চৌধুরী আমাকে নূতন করিয়া গড়িয়া দিলেন। মানুষকে বিশ্বাস করিতে শিখিলাম, বেদনার দাম দিতে শিখিলাম। কিন্তু এতকাল তোমাকে কোন কথাই লিখি নাই, কারণ জীবনে এতদিন স্থিরতা ছিল না। আজ এই চিঠির পাতায় বিনাইয়া বিনাইয়া তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেও পারিতাম, কিন্তু তাতে লাভ কি? মূল অপরাধ থাকিয়াইযায়।

চৌধুরী মশায়ের বাসায় আছি এবং তাঁহারি অধীনে কাজ সুরু করিয়াছি। দেখা হইলে তোমাকে হয়ত কিছুই

বলিতে পারিব না, কারণ বলিবার কিছুই নাই। তবু দেখা করিতে চাই।

আজ, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, জীবন-সমুদ্রের দুই তীরে চাহিয়া দেখিতেছি,—অন্তহীন পিপাসিত বালু-রাশি; তারায় তারায় তীব্র তৃষ্ণা-কাতরতা, পাতার মর্ম্মরে অসহ্য ক্রন্দন! এ-পিপাসার হাত হইতে তুমিই আজ আমায় মুক্তি দিতে পারো।

যেদিন এই চিঠি তোমার কাছে পৌঁছিবে, তাহার দুই-দিন পরে, সন্ধ্যা সাতটার পর তোমার সহিত দেখা করিতে চাই। ও-বাড়ীর সীমানার মধ্যে নয়, গাড়ী করিয়া গলির বাহিরে আসিলেই দেখা হইবে। আটটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। বিশ্বাস করি, দেখা পাওয়া খুব বেশী দুরাশা নয়। কারণ, একদিন আমার জন্য তুমি কী না পারিতে?

আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা।'—

•

দুই দিন পরে। সন্ধ্যা সাতটা। কিন্তু সরসী কোথায়? পথে জন-সমারোহের বিরাম নাই, ইহারা সবাই যেন আমার অসম্ভব স্পর্দ্ধাকে ব্যঙ্গ করিয়া চলিয়াছে! আশ্চর্য্য! যে সরসীকে একদিন ঘৃণা করিবার জন্য কত রকমেই না চেষ্টা করিয়াছি, তাহারই জন্য আজ,—!

ন'টা বাজিয়া গেছে। সরসী আসে নাই। পরিচিত বাড়ীটার উদ্দেশে পা দুইটাকে অগ্রসর করিতে চাহি, পারি না। লজ্জার বোঝা পা দুটোকে অসম্ভব ভারি করিয়া তুলিয়াছে।

হয়ত অসুখে পড়িয়াছে,—কিম্বা বাঁচিয়া নাই। বাঁচিয়া থাকিলে বোধ করি অনুরোধ অবহেলা করিত না। কিন্তু তাই বা কেন? আরও কিছু হইতে পারে, হয়ত···হয়ত কেন, তাহাই ঠিক!

রাত্রি একটা পর্য্যন্ত এক নরক-কুণ্ডে। জীবনে মদ জিনিষটা ছোঁয়া হয় নাই, সে-গৌরবও লাভ করা গেল। কিন্তু, সরসী আমার অনুরোধ রাখে নাই, এ' কথা ভোলা যায় না!

মেয়েটি নিরীহ, কাছে বলিয়া দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। ক'টা টাকা পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া যখন উঠিয়া আসি, তখন ভীরু দুই চোখে সে কি বিস্ময়! আমার মতন অদ্ভূত জীব সে যেন আর কোন দিন দেখে নাই!

বলিয়া আসিলাম, ভুল করো না। ভালবাসার ভাণ করতে তোমার কাছে আসিনি, এসেছিলুম সময়ের চাকাটাকে জোরে ঘুরিয়ে দিতে। হ'ল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখি টেবিলের উপর একখানা নীল-রঙের খাম;—সরসীর! না, সরসী মরে নাই, সুস্থই আছে। নহিলে চিঠি লিখত না। মেয়েটির কাছে, আরও কিছুক্ষণ কাটাইয়া আসিলেও চলিত! নেশায়, জিভের সহিত তালু জড়াইয়া আসে,—অক্ষরগুলি অনেক কষ্টে পড়িতে হয়!

রাত একটা

বিভাস,

তোমার মিথ্যা নামেই ডাকলাম। কারণ, অন্য নাম আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এতদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ার জন্য ধন্যবাদ!—কিন্তু, চিঠি-পত্র লেখার অভ্যেস নেই, পারিও না। এত রাত্রে ঘরের লোকটি মদে যখন একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়েচে, ঠিক সেই সময় ছাতে উঠে তোমায় চিঠি লিখতে বসেচি। মদ খেয়েচি হাত কাঁপচে। তবু ক'টা কথা লিখতে হ'বে।

লেখাপড়া শিখেছিলাম, কিন্তু খুব বেশী নয়। রাঙা চেলীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বহু লোকের কৌতুহলের মধ্য দিয়ে একদিন এক অপরিচিতের ঘর করতেও গিয়েছিলাম। অপরিচিত বটে, কিন্তু ভালবাসবার চেষ্টা বড় কম করিনি। কিন্তু তাঁর তুলনায় আমি তখন কতটুকু! মনে আছে, আমার বয়স তখন দশের বেশী নয় আর তাঁর—? অন্ততঃ চৌত্রিশ! বিয়ে না-করেও চলে যাচ্ছিল, এবং যেতও। তবু, বাপ-মার সন্তুষ্টির জন্যে একদিন সেটা করে ফেললেন!

বাঙালীর মেয়ে, ছেলেবয়েস থেকে স্বামীকে আমরা যত বেশী করে চিনি, তেমন আর কিছু নয়। কিন্তু সে চেনা কাজে লাগেনি। যতদিন সে-সংসারে ছিলাম, তার মধ্যে পাঁচটা রাত যদি তাঁর পাশে কেটে থাকে, তাই ঢের। অথচ, একদিন অনাগত এই লোকটিকে ঘিরেই কত অসম্ভব কল্পনা! হাসিও পায়।

যাক। স্বামীর স্নেহ না-ই পাই, বয়সের স্রোত রোধ করা সম্ভব হয়নি। অন্তরে-বাহিরে একদিন দুর্জ্জয় আকাঙ্খার বাণ এল…ন্যায়-নীতি ভুলে গেলাম। তারপর একদিন সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে,—বেরিয়ে পড়ি সেই গাঁয়েরই কোন পুরুষের সঙ্গে। সে-কাহিনী তোমার এবং আমার পক্ষে আজ অবান্তর। শুধু এইটুকু বলতে চাই, যেদিন পথে পা দিলুম, সেদিনও জানতাম—সেই একটি মাত্র মানুষকে আশ্রয় করেই এ-জন্মের কাহিনী শেষ হ'বে। তা যে হয়নি, সেকথা বোধ হয়, না বললেও চলে।

তারপর সেই পুরাণো কথা। শতকরা আশীজন মেয়ে যে-ভাবে এ' পথে আসে. ঠিক সেই ভাবেই আমিও এলাম। কিন্তু, যাক, সে কথা। নিজের কথা তোমায় শুনিয়ে লাভ?

তোমার জন্যে একদিন কি পারতাম বা না পারতাম, সে কথা তোমার পক্ষে আজ জানা আবশ্যক নেই। আজ তোমার জন্যে কিছুই পারি না। তোমার আগে আরও দু'জনকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেচি, কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করে লোক হাসাবার ইচ্ছে হয় না।

একটি কথা কেবল তোমায় বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি। কথাটা নিতান্ত আমাদের। আমরা যত কুৎসিত জীবনই গ্রহণ করি, নিজস্ব একটি ঘর ও একান্ত আপনার একটি মানুষের কল্পনা আমাদের সহজে ঘোচে না। সে কল্পনা একদিন আমিও করেছিলাম। কিন্তু সেটা কতখানি সার্থক হয়েচে সে তুমি জানো। এজীবনের পরিহাসই এই। যাবার জন্যে লিখেচ, কিন্তু, সত্যিই তার কোন দরকার আছে? বোধহয় হয় না।

এক পাটের দালালের আশ্রয়ে আছি। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, প্রকাণ্ড শরীর আর প্রকাণ্ড মদের পিপাসা। প্রাণ দিয়া ভালবাসে। তুমি কি আশা করো তোমার জন্যে তার কাছে অবিশ্বাসী হই! একদিন হয়ত,—কিম্বা নিশ্চয়, পারতাম; সে-সাহস আজ খুঁজে পাই না! যাকে পেলাম, সেই ঢের। কেমন ক'রে তার কাছে বলি, একদিন একটি অপোগণ্ড শিশুকে ভালবেসেছিনাম, তার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দাও। সে-ই বা দেবে কেন? সে পয়সা দেয়।

তুমি ভাবচো, সে দিনের নির্ব্বোধ সরসী এত কথা কি করে শিখ্‌ল! সত্যি, ছ'মাস আগেও, এমনি করে চিঠি লেখাবার শক্তি ছিল না; আজ পারি। অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় আজ যাকে পেলাম, তোমার জন্যে তাকেও বিদায় দেবার মত বড় প্রেম আমার কই?

কিন্তু, আমার জন্য দুঃখ করো না, এই অনুরোধ। বেশ সুখেই আছি; না থাকার কোন কারণও নেই। তোমাদের পৃথিবী আর আমাদের পৃথিবী কি এক?

হ্যাঁ, ডান-হাতের সেই উল্কীটা সেদিন এসিড্‌ দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েচি।

আজ পথে হঠাৎ কোন দিন যদি দেখা হয়, তবে চেনা তোমার পক্ষে কষ্টকর হ'বে। যেদিন রোগশয্যায় ফেলে পালাও সেদিন গায়ে একটি গহনাও ছিল না,—বন্ধক পড়েচে। কিন্তু আজ বুড়ো দালালের অনুগ্রহে সর্ব্বাঙ্গ সোণায় সোণায় আচ্ছন্ন। কেবল, ডান হাতে বিশেষ কিছু নাই,—পরিতে গেলেই উল্কীর জায়গাটা জ্বালা করে।

সম্প্রতি মদের অভ্যেসটা এত বেশী দাঁড়িয়েচে যে তুমি তা কল্পনা করতেও পার না। কারো অনুরোধ নয় নিজেই খাই। নইলে, পারি না।

ভবিষ্যতে চিঠি লেখালেখির দরকার দেখি না। পাছে, নিজেই কোন দিন এসে হাজির হও, তাই একটা নূতন বাড়ী আজ দেখে এলাম। একদিন তোমায় নিয়ে যেখানে যাবার উদ্যোগ করেছিলাম,—সেখানে নয়। চেষ্টা করলেও তুমি তা খুঁজে পাবে না। তোমার চিঠিখানি এই সঙ্গে ফেরৎ দিই।

অল্পকালের মধ্যে যদি বিয়ে করতে পারো,—নিশ্চয়ই তা পারবে, তা হ'লে আমিই তাতে সকলের চেয়ে বেশী সুখী হ'ব, কিন্তু, তাই বলে তোমার ফুল-শয্যায় গান গাইতে যাব না। আশা আছে, আমার কথা ভুলে-যাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হ'বে না, কারণ, আমি এমন কিছুই করিনি যার জন্যে চিরকাল কেউ আমায় মনে রাখবে।

কিন্তু আর নয়। এইটুকু লিখতেই অনেক সময় গেল। নেশার ঝোঁকে—সামনের সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে আসচে। কিন্তু, নির্জ্জন রাতটিকে চমৎকার লাগচে। ইচ্ছে করচে, আরো কিছু লিখি, কিন্তু লেখবার কিছু আছে কিনা মনে করবার শক্তি নেই। আর দেরী করাও চলে না, লোকটি যদি জেগে উঠে দেখে সরসী পাশে নেই, তবে তিনিও হয়ত একদিন সুযোগ সুবিধা পেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হ'বেন। একথা তোমারি অনুগ্রহে শিখেচি; সে-জন্যে কোটী কোটী প্রণাম। ইতি,—সরসী।

হাসিলাম মনে মনে। রাত্রি একটার পর সরসী চিঠি লিখিয়াছে, আজও রাত্রি একটা, নেশার ঘোরে যে-চিঠি সে লিখিয়াছে আমিও সেটা নেশার ঝোঁকেই শেষ করিলাম! কিন্তু সরসী এতক্ষণ,—আর আমিও কিছুক্ষণ আগে ছিলাম অন্যের বাহুলগ্ন!

চমৎকার!

কিন্তু এ পরিহাস কাহার?

———

মালা

শ্রীনীলিমা রায়

কথার গাঁথুনী গেঁথে তিল তিল করি'
রচিয়াছ বেদনার যে তাজ-প্রতিমা,
শুভ্র উচ্চশীর্ষ তার র'য়েছে আবরি'—
আমার আকাশ আর ধরণীর সীমা।

আঁখি মেলি' চাহি যবে—বিরাট বিস্ময়ে
প্রাণগতি স্তব্ধ হয়। ক্ষণেকের তরে
ভাবি মনে,—তব প্রেম ধরিল বিশ্ব এ,
তা' বলে' ধরিব আমি কোন্ দর্প ভরে ?

গৌরবের রাজটীকা পরায়েছে ভালে
বিশ্বের বেদনাবাহী বন্ধুজন তব
অসীম শ্রদ্ধায়। আমি বসিয়া নিরালে
গাঁথি ফুল, ভাবি মনে—আমি বাকি র'ব ?

শুধু মাল্যখানি মোর নিজ হস্তে প্রিয়,
তোমার কণ্ঠের তটে দোলাইতে দিয়ো।

কাজললতা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

এই গল্পটি আগামী চৈত্র পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রতিমাসে বাহির হইবে। প্রবোধ-কুমারের সুসংযত চিন্তার ধারা ও সুললিত ভাষা এই গল্পটিকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

মুখের উপর থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সত্যেন বল্‌ল—আশ্চয্যি, তুমি মাটি না পাথর? গায়ে কি একটি ফোঁটাও রক্ত নেই?

অসংখ্য চুম্বনের কয়েকটা ভিজা দাগ সুলতার সমস্ত মুখ খানার ওপর স্পষ্ট ফুটে রয়েছে তখনও,—বল্‌ল—হাঁপাচ্ছ কেন?

বর্ষায় ধোয়া মাটির মত কোমল গা। সুদীর্ঘ চুলের রাশ পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়লে কালো আকাশের মেদুরতা মনে পড়ে। অন্ধকার দুটি তারা চোখের, বড় বড়—স্থির; পল্লবের গোড়ায় কাজলের রেখা টানা বলে সন্দেহ হয়।

দেখি?—বলে' তার মুখখানি এক হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সত্যেন বল্‌ল—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, সত্যি হাসির কথা নয়—চোখের পলক পড়লে মনে হয় যেন গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রকাণ্ড একটি পাখী উড়ে যাচ্ছে! আর তোমার নিশ্বাস? তোমার নিশ্বাস নিয়ে কবিরা কবিতা লেখে—হাস্‌চ? না সত্যি বলছি, তুমি কাজের লোককে অকেজো করে' দিতে পারো। তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুলে মনে হয়, মৌমাছি হলে আমি মরে' যেতাম!

বিবাহিতা স্ত্রী নয় তাই রক্ষে, নৈলে সত্যেনকে তিরস্কৃত হতে হতো। প্রেমের যে দুরন্তপনা সেটা সত্যেনের মধ্যে কিছু বেশী।

সমুদ্র না হোক জল ত বটেই। জলে কোনো দাগ পড়ে না! না প্রেমের, না ঐশ্বর্য্যের, না বন্ধুত্বের। কিন্তু মনের একটি শান্ত মাধুর্য্য মুখখানিকে তার সর্ব্বদাই সিগ্ধ করে' রেখেছে। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ভুক্তভোগী নরনারী তার মুখখানি একবার দেখলে শান্তি পেতে পারে!

ভিখারী এসে তার করুণ পরদুঃখকাতর মুখখানি দেখে ভিক্ষা নেবার কথা ভুলে যেত।

গাছ-পালা, বিড়াল-কুকুর, পাখ্‌-পক্ষী তার কাছে সমানই প্রিয়বস্তু।

সত্যেন বল্‌ল—যাবে? তাই চল যাই, কোনো পাহাড়ের চূড়ায় কিম্বা কোন নদীর ধারে! না না, তার চেয়ে চল সাগরের তীরে গিয়ে থাকি—ঢেউয়ের পর ঢেউ আর তুমি, এই নিয়ে কাটাবো! লোকের ভিড়ে ভালবাসাকে বোঝা যায় না; তার চেয়ে মরুভূমি ভাল, প্রাণ ভরে' সেখানে দু'জনে নিশ্বাস নেবো; পথহারাদের ছায়া দেবো,—আচ্ছা, আমাকে ভালবাসো—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এ-কথাটা একবার বলতে পারো না?

সুলতা বাইরের দিকে তাকালো। কোনো কথাই তার মাথায় এলো না। বলবার মত কথা কি জীবনে তার কিছু জমা আছে? মন তার একেবারে নির্ব্বাক! সেখানে না আছে জোয়ার না আছে ঢেউ। যেমন সীমাহীন তেমনি শব্দহীন!

বল্‌ল—শুনে কি হবে?

কিছু না! পাখীর গান না শুনলে কি দিন যায় না? কিন্তু সারাদিনে তোমার সারাশব্দ যদি না পাই তাহলে আমার কাজকর্ম্মের শক্তি যোগায় কে বলত? তোমাকে আধমরা বলে মনে হওয়া কি অন্যায়?

সুলতা মাথা হেঁট করে রইল—মুখখানি তার অল্পে অল্পে রাঙা হয়ে উঠছিল মানুষকে কেমন করে' আনন্দ দিতে হয় তা তার জানা ছিল না। নিজের অক্ষমতা স্মরণ করে' বেদনায় তার ভেতরটা টন্‌ টন্‌ করতে লাগলো।

তুমি মুখর হয়ে ওঠো—সত্যেন বল্‌ল—চঞ্চল হও, তুমি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে যাও, তোমার নাচের সঙ্গে মাটি কথা কয়ে উঠুক আর আমি ভ্রমরের মত—

সুলতা বল্‌ল—কি সব বল্‌চ?

প্রলাপ! প্রলাপ বলার খ্যাতি আমারই একচেটে! বিশেষ করে' কোনো মেয়ের কাছে. ওটা আমার খেলে ভাল! কিন্তু ক্ষমা করো, তোমার আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে আমি পাগল হয়ে উঠি। ওটা কি তোমার হাতে?

চিঠি। বড়দির। এই একটু আগে এসেছে।

তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে সত্যেন পড়লো—

ভাই সত্যেন,

তোমার ও সুলতার প্রতি আশীর্ব্বাদের ভাষা আমার নেই। যে সৎসাহসে তুমি বিধবা সুলতাকে সঙ্গিনী করে নিয়েছ সেই আলো চিরদিন যেন তোমার মধ্যে উজ্জ্বল থাকে। তোমার প্রেরণায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই অধঃপতিত সমাজ আজ থেকে এই উদারতাকে যেন বরণ করে' নিতে পারে, তোমার গৃহ-প্রবেশের দিনে এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সুলতাকে আমার ভালবাসা দিয়ে চিঠি লিখিতে বলো। ইতি—

তোমাদের দিদি।

চিঠির একটা উত্তর লিখতে হবে ত!

সুলতা বল্‌ল—হবে বৈ কি, আমিও লিখবো।

কি লিখবে তুমি?

লিখবো যে,—তারপর আর কোনো কথাই সুলতার মনে এল না।

সত্যেন হঠাৎ হো হো করে' হেসে উঠতেই সে ফিরে তাকালো। বল্‌ল—বলে দাও না কি লিখতে হবে!

লিখে দিও যে তুমি একটি আস্ত বোকা!

সুলতা খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ কি যেন একটা আবিষ্কার করে' উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠলো—ওঃ এবার ঠিক বুঝতে পেরেছি—ঠাট্টা!

তাই নাকি? বুঝতে পেরেছ? এবার একটু একটু সবই বুঝতে পারবে! ক্রমে বুঝবে গোলাপের চারা এনে কেন বাগানে বসিয়েছি, আমার বারান্দার দক্ষিণ দিক কেন খোলা, তারপর বুঝবে চাঁদের আলোয় রজনীগন্ধা কেন দুলে দুলে উঠে। সুলতা, তুমি কথা যদি না বল ত চুপ করে' থেকো। আমি সকাল থেকে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের মধ্যে, সহস্র লোকের দেনা-পাওনার মধ্যে যে গান মনে মনে তৈরী করবো, সেই গান সমস্ত রাত ধরে' তোমার কাণে শোনাবো আর তুমি এলোচুল দিয়ে আমার মুখ ঢেকে দেবে।

সুলতা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সত্যেন বল্‌ল—মনে তোমার দাগ না পড়ুক, চোখে তোমার আনন্দ যদি না ফেনিয়ে ওঠে, গা যদি না-ও রোমাঞ্চ হয়—না হোক, আমাকে শুধু বলতে দিও।

নিজের জীবন ও যৌবন সম্বন্ধে তার কি কোনো চেতনা আছে? হয়ত নেই, অন্য কেউ হয়ত তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত না করলে সে আপনাকে ঠিক মত বুঝতে পারে না। নিজেকে জানতে হলে অন্যের দ্বারস্থ হওয়াই যেন তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে যে বেঁচে আছে, একথা তাকে বারম্বার জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু সত্যেন তার জন্যে অনেক করেছিল। লোকমতের আঁচ্ থেকে তাকে সর্ব্বদা রক্ষা করতে সে নিজকে বিপন্ন করতেও ত্রুটী করেনি। আপনাকে বিপন্ন করাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গায়ের রক্ত তার কোন সময়েই ঠাণ্ডা নয়—তার মধ্যে যেমনি চঞ্চলতা তেমনি আগুনের উত্তাপ। বাঁচবার মতন বাঁচতে সে যদি না পারে ত সমারোহ করে মরণকে ডেকে আনতেও সে এতটুকু পশ্চাদ্‌পদ নয়। সুলতাকে ভালবাসার মধ্যেও তার একটি চমৎকার উদ্দামতা আছে। সে প্রেম যেমন অস্থির তেমনি নিত্যনূতন। সে প্রবাহের মুখে কোনো শিলাই দাঁড়াতে পারে না—আপনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করেও সে বাধাকে এড়িয়ে চলে' যাবে।

স্বামীর প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় সুলতার চোখ দুটি জলে ভরে' উঠলো।

সত্যেন্দ্রনাথ স্বামীর মত স্বামী। জীবনে যেমন আশাও তার অনেক, আকাঙ্খাও তেমনি বহুমুখী। বহু অর্থ উপার্জ্জন করবে, প্রচুর ভোগের মধ্যে থাকবে, দুহাতে দরিদ্রদের দান করবে, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আনন্দ কোলাহল করবে, দাম্পত্য-জীবনে একটি বড় প্রেমের তপস্যা করবে।

রাত্রে মাঝে মাঝে এই নিয়ে সুলতার কাছে সে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করে। সুলতা নিঃশব্দে একান্তমনে তার কথাগুলি শুনে যায়। কথার উত্তর সে অতি কষ্টে জোগাতে পারে কিন্তু কথা আরম্ভ করবার মত শক্তি তার ছিল না।

সত্যেন ক্লান্ত হয়ে এক সময় চুপ করে। এক আধটা কথা অন্তত বলা উচিত এই মনে করে' সুলতা তখন বলে—কাল সকালে উঠেই ছবিগুলো টাঙিয়ে ফেলতে হবে। কেমন?

হেসে সত্যেন বলে—এই নিয়ে তিনবার এই কথাটা শুনলাম।

না সত্যি, আর ওই কড়িকাঠে ভাল করে' আল্‌কাতরা লাগাতে হবে নৈলে উইপোকা লাগতে পারে; তা ছাড়া ঘরের জান্‌লা ক'টায় পর্দ্দা লাগিয়ে না দিলে রাস্তার লোকজন—

বেশ ত, কালই সে ব্যবস্থা করে' নিও।

একটু সাহস পেয়ে সুলতা বলে—রান্না ঘরটা কিন্তু বদল করে নেবো! এ ঘরে ধোঁয়া ঢুক্‌লে কিন্তু ভাল হবে না!—হঠাৎ গল্‌গল্‌ করে' তার মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসে—আচ্ছা ছাদের আলুসেতে যদি গোটাকতক ফুলের টব বসানো যায় তাহ'লে কেমন হবে? আর এই ত তুমি বল্‌ছিলে এটা আকাশ-পিদিমের মাস, কাল একটা আলো টাঙিয়ে দিও—কি বল?

সত্যেন বলে—হুঁ।

অপূর্ব্ব স্নেহের স্বরে সুলতা বলে—ঘুমুলে বুঝি?

না, কেন বল ত?—বলতে বলতে সত্যেন উঠে বসে। দেখে স্নেহে, প্রেমে, মাধুর্য্যে, আবেগে সুলতার সুন্দর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—ওই বেলতলার ছাদটাও ঘিরে দিও। ছোট ছেলে-পুলে ওখান দিয়ে প'ড়ে যেতে পারে। রাজমিস্ত্রি আর ছুতোর ডাকিয়ে,—কই, সবুজ রঙের আলোর ডুমু গোটা-কতক আনবে বলেছিলে যে? সাদা আলো সব সময় তোমার চোখে যে সয় না!

আপনার কথার আনন্দেই সর্ব্বাঙ্গ যেন তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এই সরল, বিশেষত্বহীন, নির্ব্বোধ মেয়েটির মৃদু প্রগল্‌ভতা, ভীরু সঙ্কুচিত একটি পাখীর এই আকস্মিক কল-কাকলী সত্যেনকে মুহূর্ত্তেই একেবারে মুগ্ধ করল। একটু হেসে বল্‌ল—বাজে কথা তোমার মুখে এমন চমৎকার শোনায়, ভালবাসার ভাষা তোমার মুখে যদি শুনতে পেতাম সুলতা!

তারপর আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সত্যেন তাকে কাছে টেনে নিল।

আহারে বসে সত্যেন একেবারে অবাক হয়ে যায়।—

এ কি, এ যে রাজভোগ, এত কি হবে?

সুলতা এক পাশে বসে থাকে। বলে—এমন্ আর কি?

পাগল কোথাকার, আমি কি রাক্ষস?

দুজনেই হাসে।

—পরিমাণে যে কোনোটা বেশী তা বলছিনে, কিন্তু এত রকমের খাবার যোগাড় করতে মানুষকে অনেক বেগ পেতে হয়। একেবারে নিখুঁৎ! কোন্‌টা আগে খাই বল ত?

লজ্জায় সুলতা মাথা হেঁট করে' থাকে। হেসে, আনন্দে, সোরগোল করে' সত্যেন খেতে সুরু করে' দেয়। প্রত্যেকটি আশ্চর্য্য বস্তু আস্বাদন করবার জন্য স্ত্রীর কাছ থেকে যে একটি মধুর অনুরোধ আসা উচিত, সত্যেন সেকথা একদম ভুলেই যায়; অনুরোধের ভাষা, নিকটতম আত্মীয়তার ভাষা সুলতার মুখেও আসে না। ব্যাপারটা দাঁড়ায় এমনিই যে একজনের আনন্দোচ্ছ্বাস আর অপর জনের নিঃশব্দতা—কেউ দাঁড়িয়ে দেখলে হঠাৎ কোনো রূঢ় মন্তব্য সুলতার প্রতি আসতে পারে।

আহার কোনো রকমে শেষ করে' উঠে সত্যেন বলে—জান না বুঝি মেয়েরা কেমন করে' মাথার দিব্যি দিয়ে স্বামীদের খাওয়ায়?—বলে' একটুখানি করুণ হাসি হেসে সে কলঘরের দিকে চলে' যায়।

কাছারি থেকে ফিরে সবাই একটু ব্যস্ত ভাবে ঘরে এসে ঢোকে।

—পথ ছেড়ে একটু কোথাও সরে' গিয়ে বসো দেখি সুলতা! পায়ে পায়ে ঘুরলে হয়ত তোমার লেগে

যেতে পারে, যে গোঁয়ারের মত আমি হাত-পা ছুঁড়ছি!

ভীরু শশকের মত সুলতা এক পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এতবড় অপরাধ সে যেন আর কোনো দিন করেনি!

সত্যেন আর কিছু বলে না, শ্রান্ত ভাবে নিজের হাতেই জামার বোতাম খোলে, মাথার টুপিটা হুকে টাঙিয়ে দেয়, পায়ের মোজা খুলে রাখে—তারপর একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে' দেখে—সরবৎ, জলখাবার, পান, সিগারেট সবগুলি পাশাপাশি সাজানো।

হাসি আর সে চাপতে পারে না। বলে—দরকারি জিনিস ত সবই পেয়ে গেছি, তবে আর তোমাকে এখানে দরকার কি!

তাই ত, এই সামান্য কথাটা এতক্ষণ তার মনে হয়নি! সে ত ভয়ানক বোকা!

—থাক্ থাক্, আমি যেতে বলিনি- তুমি যদি যাও, আহারের রুচিটাও চলে যাবে তোমার সঙ্গে। সুলতা, আজকাল কি তুমি অনুরাগ ছেড়ে রাগের মহলা দিচ্ছ?

একটুখানি থতিয়ে সুলতা এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বল্‌ল—রাতের জন্যে আবার রান্নাবান্না -

সে ত রাতের কথা! পশ্চিম দিকটা এখনও রাঙা হয়ে রয়েছে, সন্ধ্যাতারা এখনও মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে—রাতের এখনও অনেক বাকি সুলতা!

তারপর দুজনেই চুপচাপ।

সত্যেন বল্‌ল—সামান্য মানুষ, সামান্য একটু আরামের জন্যে কাতর হয়ে পড়ি। যে ক'টা দিন বাঁচি, হেসে-খেলে, হৈ-চৈ করে' চলে যাবার ইচ্ছে।

দেখতে দেখতে সুলতার ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠলো। মৃদু কণ্ঠে বল্‌ল—এটা আমার সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি ইচ্ছে করে এমন অন্যায়—

বলতে বলতে বড় বড় দু ফোঁটা চোখের জল তার গালের ওপর গড়িয়ে এল।

সত্যেন কাছারিতে গেলে সুলতা সারাদিন তার কথা নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করে। কাজের চাপ থেকে এই মানুষটির যদি এতটুকু অবকাশ আছে! সত্যেন বলেছিল, আজকাল মক্কেলের ভিড় সমস্ত দিন ধরে তার হয়ে লেগেই রয়েছে। আচ্ছা, দিনরাত একটা লোক যে তোমাদের কাজ নিয়েই আটকে থাকবে বাপু, এর পরিশ্রমটা কি তোমরা দেখতে পাও না? সত্যেন বলেছিল, মক্কেল কোনো-কোনোটা তার একেবারে ছ্যাঁচ্‌ড়ার এক শেষ! সুলতাও ঠিক সেই কথা ভাবে— সবাই কি আর ভাল লোক হয়! কিন্তু এই মন্দ লোকগুলো কি একটু সরল প্রকৃতির হতে পারে না? এর জন্যে ত আর তোমাদের কষ্ট করতে হয় না বাপু, কিছু খরচ করতেও হয় না,—বরং এতে নিজেরই উপকার!

সুলতার ইচ্ছা করে একবার ভাল করে' তাদের বুঝিয়ে দিয়ে আসে। জান্‌লার ধারটিতে বসে তাকে অনেক কথাই এমনি করে' ভাবতে হয়। আশ্চর্য্য, তার অভাবে এই আত্মভোলা মানুষটির কি করে' চল্‌তো কে জানে! পথ দিয়ে এই যে এতগুলি লোক চলেছে, এদের একজনেরও অন্তর সত্যেনের মত এমন উদার নয়! সত্যেন যেন এদের প্রত্যেকের মনুষ্যত্বটুকু ছেঁকে তুলে নিয়ে আপনার মধ্যে সঞ্চয় করে' রেখেছে।

জান্‌লার অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়ায় সুলতার চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হয়ে আসে। মনে হয়, তার সমস্ত মন জুড়ে সত্যেন পদ-চারণা করে বেড়ায়। এই স্নেহপ্রবণ, উদার হৃদয়, একনিষ্ঠ স্বামীটি ছাড়া জীবনে যেন তার আর কিছুই নেই। ভিতরে যতদূর পর্য্যন্ত তার নজর চলে, সত্যেনকে ছাড়িয়ে আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। অন্তরের আকাশকে রূপে-বর্ণে আচ্ছন্ন করে' তার জীবনে যেন প্রথম সূর্য্যোদয় হয়েছে! সত্যেন তাকে আবৃত করেছে, মুগ্ধ করেছে!

আজকাল সুলতার লজ্জা একটু একটু ভেঙেছে। লজ্জার চেয়ে একটি ভীরু সঙ্কোচ বললেই শোনায় ভাল।

সত্যেন বাড়ী আসতেই সে গিয়ে তার একটি হাত ধরে। হাত থেকে বই কাগজগুলি নামিয়ে নেয়। জামার বোতাম-গুলি খুলে দিয়ে আঁচল নেড়ে হাওয়া করে। জুতোর ফিতে

খুলে দেয়। মাথার চুলগুলি সত্যেনের পায়ের ওপর এলিয়ে পড়ে।

—ওকালতি করার মত পাজি কাজ আর দুনিয়ায় কিছু নেই, বুঝলে সুলতা!

সুলতা বলে, ঠিকই ত, আমিও ওই কথা ভাবছিলাম। ওকালতি করতে গেলে ভারি মিথ্যা কথা বলতে হয়।

শুধু তাই? পয়সা চাইলেই ব্যাটারা মাথা চুলকে বসে।

ওই ত নিয়ম! একবার কাজ হয়ে গেলেই—বাস্! ফাঁকি দিতে পারলে কি কেউ ছাড়ে?

সত্যেন বলে—তুমি কি করে' এত জান্‌লে?

বড় বড় দুটি সরল দৃষ্টি তুলে সুলতা বলে—তুমিই ত বলতে!

আমি বলতাম! ও—আমার কথাই বুঝি এখন তোমার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে?

সুলতা আর কিছু বলে না, সরবতের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার ভঙ্গীটির প্রতি একবার তাকিয়ে সত্যেন বলে—তোমাকে উদাসীন বলে' কতকটা ভুল করেছিলাম, আমায় ক্ষমা করো সুলতা!

তা বলে' এত খেটে খেটে আমি তোমায় শরীর নষ্ট করতে দেবো না, তা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি।

সত্যেন করযোড়ে বলে—দেবি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

স্বামী তার কথা শুনেছেন—আনন্দে আবেগে সুলতা একবার জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আবার সরে' এসে বলে—আমি বলছিলাম বরং—বরং তোমার কাজগুলো আমায় এনে দিও; তা বলে আমাকে একবার দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে নৈলে হয়ত ভুল করে' ফেল্‌বো—যে ভুল করা আমার অভ্যেস!

সত্যেন একটু একটু হাসছিল।

তা আমি পারি, দেখিয়ে দিলে অনেকেই পারে,—তা ছাড়া কিছু কিছু আমারও ত করে' দেওয়া উচিত। চুপ করে' বসেই ত থাকি!

সত্যেন কিছু বল্‌ল না, কেবল তাড়াতাড়ি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল।

ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়টায় সত্যেনের একদিন জ্বর এল।—

পীড়িত কোনো মানুষের দিকে তাকালে সুলতার বুক বেদনায় ভরে'ওঠে। আস্তে আস্তে সে স্বামীকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লো।

সত্যেন বল্‌ল—জ্বর সামান্যই, এরই মধ্যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেল?

সুলতা বল্‌ল—ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি, নীলরতন সরকার ছাড়া কারো হাতে আমার বিশ্বাস নেই।

ডাক্তার নীলরতন এসে দাঁড়াতে সুলতা তাঁর হাত ধরে' কেঁদেই অস্থির!

—বাঁচান্ ডাক্তার বাবু, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান্!

ডাক্তারবাবু হেসে সুলতার পিঠ চাপ্‌ড়ে দিয়ে বল্‌লেন—কিছুই না, তোমার স্বামীর কোনো রোগই নেই, সামান্য একটু সর্দ্দি জ্বর।—বলে' তিনি অন্যদিকে চেয়ে একটি প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্ লিখে দিলেন।

চোখ মুছে সুলতা বল্‌ল—আবার কবে আসবেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, এরকম রুগী দেখার চেয়ে আমার দেশ ছেড়ে পালানো ভাল!—কোনো দরকার নেই আমার আসবার, কেন মিছামিছি—মা তুমি ছেলেমানুষ, একটু বুদ্ধিমতী হও।—বলে তিনি হাসিমুখেই আবার বেরিয়ে চলে' গেলেন।

সুলতা ঔষধ আনালো, থার্ম্মমিটার আনালো; আঙুর-বেদানা আন্‌তে বাজারে পাঠালো। তারপর রোগীর পক্ষে যতগুলি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সবগুলি ভেবে ভেবে ফর্দ্দ করতে লাগলো।

সত্যেন একবার তাকিয়ে দেখলো, চোখদুটি তার ফুলে উঠেছে, রোগশয্যায় শুয়ে থেকে নিজকে সে ধন্য মনে করলো। স্মিতমুখে শুধু বল্‌ল—চমৎকার!

কাছে এসে সুলতা বল্‌ল—ভাল হয়ে যাবে, ভয় কি?

কতদিনে ভাল হব সুলতা? যে পরিশ্রম, দিন কয়েক শুয়ে থাকতে পারলে মন্দ হয় না!

সুলতার চোখে আবার জল এল। বল্‌ল—আমার অন্যায়তেই তোমার এই হয়েছে! তোমার ঠাণ্ডা লাগছে, খাওয়া দাওয়ার যত্ন নেই, সময়মত আমি যদি একথা বলতাম তা হলে আর এমন,—আমায় তুমি মাপ কর!—বলতে বলতে শিশুর মত সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

জর অবশ্য সত্যেনের একটু বেশীই হয়েছিল। চোখ লাল, মাথা ভার, একটু একটু কাসি। সুলতার স্নানাহারের আর সময় ছিল না। সমস্ত দিন ধরে' সেবা-যত্নে তার আর ক্লান্তি নেই। নিকটেই কোথায় গয়লা-পাড়া, খাঁটি দুধের জন্য প্রাতঃকালে গায়ে-মাথায় মুড়ি দিয়ে সে দুধ আনে। আঙুর, বেদানাগুলি নিঙড়ে রস বা'র করে। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে মেপে মেপে ওষুধ ঢালে। তা ছাড়া যখনই দেখো তখনই সে কাছে বসে স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে; নয়ত বাতাস করছে, নয়ত কিছু খাওয়াচ্ছে,—কিছু না হোক অন্তত নিঃশব্দে চোখের জলও ফেলছে! রাত্রে সে নিদ্রা ত্যাগ করেছে। সারারাত্রি সে জেগে শিয়রে বসে থাকে। এক-একবার তন্দ্রা এলে সে আবার চম্‌কে ধড়মড় করে' সোজা হয়ে বসে!

এমনি করে' আপনার সমস্ত তপস্যা, নারীত্বের মহিমা, অন্তরের প্রীতি, ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-সুখ, আদর্শ এক-নিষ্ঠতা—সর্ব্বান্তঃকরণে স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নিবেদন করে' আপনাকে সে সার্থক মনে করতে লাগলো।

সত্যেন কয়েকদিন পরে যেদিন একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো—একটু দুর্ব্বল হলেও চেহারা তার ফিরে গিয়েছিল। রোগশয্যা যেন তার তীর্থক্ষেত্র, যখন উঠে এল তখন তার উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে।

বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও সুলতা তাকে ধরে' ধরে' বাইরে আনে! একান্ত স্নেহে তাকে সদা-সর্ব্বদা সাবধানে রাখে। সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এখনও তার কাছারিতে বেরোবার হুকুম নেই। ঘড়ির কাঁটা ধরে' এখনও তাকে স্নানাহার করতে হয়।

ক'দিন পরে সুলতার মুখের দিকে একবার ভাল করে' তাকিয়ে সত্যেন থম্‌কে দাঁড়ালো। একটি মনোরম মালিন্যের ছায়া যেন তাকে ঘিরেছে! চোখ দুটি একটু অলস, দৃষ্টি যেন শ্রান্ত; কৃশ তনু,—পার্ব্বতীর মত তপঃক্লিষ্টা!

দেখ্‌ছ যে? কি?

সত্যেন একটু উচ্ছসিত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌ল—মন্ত্রের জোরে তোমাকে ঘরে আনিনি সুলতা, ভালবেসে তোমাকে পেয়েছি! এ কি সত্যি নয়?

সুলতা তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সমস্তটাই জানিয়ে দিল।

সেদিন সন্ধ্যার আকাশে কেন যে কুয়াসা ছিল না কে জানে! একটা বড় সুপুরি গাছের পাশ দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো এসে বারান্দার একটা ধারে পড়েছিল। সমস্ত আকাশটায় তারা ছড়িয়ে রয়েছে!

সত্যেন এতক্ষণ চুপ করেই ছিল, এবার বল্‌ল—দেখেছ সুলতা, দিনের বেলা এত আলো, এত গোলমাল কিন্তু রাতের বেলা চাঁদ ওঠে! রাতে মনে হয় দিনটা মিথ্যে, আর দিনের আলোয় রাতের কথা ভাবলে হাসি পায়—আশ্চর্য্যি নয়?

সুলতা বল্‌ল—তাইত, আমিও ভাবি!

একটু থেমে সত্যেন বল্‌ল—আজ দিনের বেলা একটা কথা ভেবে হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সন্ধ্যে হতেই নেশার মত সে যেন মনটাকে পেয়ে বসেছে! মানুষের মন ভারি আশ্চর্য্য জিনিস সুলতা!

কি বল ত? আচ্ছা বলই না কি? আজকাল ত তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি। পারিনে?

তোমাকে শোনাবার মত যদি না হয়?

আমাকে শোনাবার মতন নয়? চোর-ডাকাতের কথা বুঝি?

সত্যেন হাসতে লাগলো। সুলতা তার হাতটি ধরে' বল্‌ল—তা হোক, বল। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাদের কোনো দুঃখের কথা বলবে। তা ছাড়া তোমার

কথা কি আর আমার কাছে চেপে রাখতে পারবে?

সত্যেন বল্‌ল—ঘুমের ঘোরে আজ বহুকালের একটা পাগ্‌লামির কথা ভাবছিলাম। স্বপ্ন ঠিক নয়, খেই যেখানেই হারায় আমার মন অমনি সেটাকে ভরাট করে' দেয়। অনেক দিন আগে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বহুদিন ধরে' দুজনে নানা জল্পনা করেছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে বিয়ে করব তাও ঠিক করেছিলাম···কিন্তু রাস্তার ধারে একদিন দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাদেরই বাড়ীতে আগে শানাই বেজে উঠলো, মেয়েটা হাসতে হাসতে গেল শ্বশুর বাড়ী। আমিও হাসতে হাসতে জীবন-সংগ্রামে বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আজ দুপুর বেলা স্বপ্নে দেখি—

কি দেখলে?

দেখলাম, তার চোখের মধ্যে এত বর্ষা কোথায় জমা ছিল? সে যে একেবারে প্লাবন! প্রথম ভালবাসাই বোধহয় জীবনের সব চেয়ে বড় স্মৃতি! ঘুমের ঘোরে আমিও যে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলাম তা ত আর অস্বীকার করতে পারিনে! মেয়েটাকে দরিদ্র বলে মনে হল না, শোকাতুর বলেও মনে হলো না—মনে হলো তার পাঁজরের মধ্যে একটা তীর বিঁধে রয়েছে, দর্ দর্ করে' রক্ত গড়াচ্ছে, মুক্তি পাবার জন্যে সে যেন ছটফট করছে! কিন্তু আশ্চয্যি, আমিও জানতাম না যে আমি এত দুর্ব্বল! আমি এমন হিসেবী লোক হয়েও সেই অসম্ভবের জন্যে কাঁদতে পারি, একথা কি জানতাম? সুলতা, ঘুমের মধ্যে আমরা আমাদের আসল মানুষটির খোঁজ পাই!

সুলতা সাড়া দিল না।

সত্যেন বল্‌ল—কিন্তু সেই মেয়েটার দিক থেকে কি কোনো হদিস্ পাওয়া যেতে পারে? আচ্ছা সুলতা, তোমার প্রথম স্বামীর সম্বন্ধে কি মনে হয় বলবে? ও কি, কাঁদচ কেন? যাক্, আমার পুরোনো প্রেমের কাহিনী এবার সত্যিই সার্থক হলো!

তারপর ঝোঁকের মাথায় সে আবার জিজ্ঞাসা করে' বস্‌লো—আমার কথার উত্তর দেবে না সুলতা?

সুলতা বল্‌ল—তাঁর কথা আমি বল্‌তে পারিনে।

বেশ ত, তোমার কথাই বল। না না, এতে লজ্জার ত কিছু নেই! তা ছাড়া আমার মতন ত আর নয়, তুমি যে তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছিলে!

সজল মৃদুকণ্ঠে সুলতা বল্‌ল—তিনি ছাড়া আর আমার কেউ ছিল না! আমাদের দুঃখুও ছিল না, অভাবও ছিল না! তা ছাড়া তাঁর মত ভালমানুষ আমি সত্যিই কোথাও দেখিনি!

কোথাও না?

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আবেগে সুলতার গলা কেঁপে উঠছিল। বল্‌ল—না, আমি তেমন আর কোথাও দেখিনি!

আচ্ছা, তিনি তোমায় খুব ভালবাসতেন—না?

হুঁ, তিনি কোথাও থাকতেন না আমায় ছেড়ে।

পশ্চিমের চাঁদ, পশ্চিমেই হেলে পড়েছে। উত্তরে-হাওয়ায় সুপুরি গাছের পাতাগুলোর মধ্যে সর্ সর্ করে' শব্দ হচ্ছিল। একটা ঠিকা-গাড়ীর শব্দ দূরে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল।

সত্যেন একটু নড়ে' চড়ে' সাগ্রহে গলা বাড়িয়ে বল্‌ল—আর তুমি? তুমি তাঁকে ভালবাসতে না?

সুলতা কেঁদে বল্‌ল—আমি মেয়েমানুষ, তাঁর সেই ভালবাসার জন্যে আমি কতটুকু,—

তা নয়, তুমি ভালবাসতে কিনা তাই বলছি।

সুলতা বল্‌ল—তিনি ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারলাম না! কত কাঁদলাম, ঠাকুরের পায়ে কত—

ও—বুঝেছি।—বলতে বলতেই সত্যেন মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে পুনরায় বল্‌ল—সব অন্ধকার যে! নাঃ সুলতা, তুমি আজকাল কিছুই দেখো না! মাথাটা বোধ হয় একটু—না, না, তা বলে' জ্বর নয়, আমি বেশ আছি। বরং একা একা একটু বিছানায় গিয়ে শুই গে।

প্রায় টল্‌তে টল্‌তে সে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। বিছানার ওপর বসে' তার মনে হলো, নিজের হাত-পা-মুখ সর্ব্বাঙ্গ যেন অতিরিক্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছে! একটা তীব্র জঘন্য দুর্গন্ধে এই সুসজ্জিত ঘরখানি যেন ভরা! ঘরের ভেতরকার এই বিচিত্র ঐশ্বর্য্য, চারিদিকের এই বহুমূল্য আসবাব, সবগুলি যেন তাকে অচ্ছেদ্য পাশে আবদ্ধ করেছে; বন্দী করেছে!

—ক্রমশ

———

ভিক্ষুক

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

কেন হায় ভিড় করো হুয়ারে আমার ?
আমার আছে কি কিছু ?
এ মলিন মন নিয়ে গৃহকোণে আছি--
তোমাদের সহচর হ'ব,—
কোনো দিন নাই এ হুরাশা !
তবু কেন আস' দলে দলে ?

কেহ শুষ্ক, সবুজ কেহ বা—
আছে কা'রো কত প্রচুরতা,
কত হাসি ভাসিছে নয়নে !
কা'রো পাংশু মুখ হেরি'
নেত্র মোর ভ'রে উঠে নীরে !
তোমরা কী চাও মোর কাছে ?

ক্ষমা কোরো, আমি যে অক্ষম ;
একেলা থাকিতে চাই
তোমাদের সবাকার পিছে !
পথে ও বিপথে
মানুষের বনে বনে ঘুরিয়াছি বহু !
শ্রান্ত মন
করিব অর্পণ আপনার কাছে আজ !

তোমাদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে,
তোমাদের নিঃশঙ্ক গতিতে,
চকিত-বিভ্রান্ত শত নয়নের মাঝে,
তবু এ হৃদয়
একটি অস্ফুট স্বর চাহে শুনিবারে !
হুইটি চরণে যে সঙ্গীত বেজে উঠে
সে সঙ্গীত চাহে শুনিবারে !
হুইটি নয়নে যে প্রাণ কাঁপিতে থাকে,
সে প্রাণের দোলা চায় মন !

———

চরিত্রহীন

শ্রীঅবনীনাথ রায়

'লে মিজারাব্‌ল' ইংরাজিতে তর্জ্জমা করলে যেমন হয় 'The Miserables' অর্থাৎ কিনা 'হতভাগ্যেরা', শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' মানেও তেমনি 'চরিত্রহীনেরা'। বিড়ম্বিত এই দলের ভাগ্য সম্বন্ধে যেন একটা সূক্ষ্ম মিল আছে বলে মনে হয়।

শরৎবাবুর উপন্যাসখানির নাম যদিচ চরিত্রহীন, কিন্তু তাদের আসলে কেউ চরিত্রহীন নয়, বইখানির এইটুকুই হচ্চে মজা। সতীশ আর সাবিত্রী, দিবাকর আর কিরণময়ী কেউই চরিত্রহীন নয়। সতীশ সাবিত্রীকে নষ্ট করতে পারে নি, দিবাকরও কিরণময়ীকে নষ্ট করতে পারে নি। অথচ সমাজের বিচারে তারা ত চরিত্রহীন বটেই, হয়ত আরো কিছু বেশী। কেননা সতীশ লুকিয়ে মদ খেত, আর বাসার একটা ঝিকে ভালবেসেছিল। কিরণময়ী তার দেওরকে ভুলিয়ে নিয়ে আরাকানে পালিয়েছিল। সমাজ এইটুকু শুনেই কাণে আঙ্গুল দেবেন কিন্তু যাঁরা উপন্যাসখানি শেষ পর্য্যন্ত পড়েচেন তাঁরা জানেন যে প্রকৃত অপরাধ বল্‌তে যা' বোঝায় তা' এঁদের কেউই করেন নি।

উপন্যাসখানিতে ছুটি-ভালবাসার প্রসঙ্গ দেখান হয়েচে আমাদের সামাজিক বুদ্ধিতে যা' হচ্চে নিন্দনীয়—এক হচ্চে সতীশের সাবিত্রীকে ভালবাসা, আর হচ্চে কিরণময়ীর উপেন্দ্রকে ভালবাসা। অথচ সকলের উপরের কথা হচ্চে এই যে কোন ভালবাসাই গর্হিত নয়, যেহেতু ভালবাসা একটা কাজ নয়; ও হচ্চে মনের একটা বিশেষ শক্তি। কোন্‌ ক্ষেত্রে কাকে অবলম্বন ক'রে এই শক্তি বিকাশ লাভ করবে তা' বল্‌বার যো নেই। কোন ভালবাসাই যে কারুর সমর্থনের অপেক্ষায় বসে থাকে না একথাও সহজে বোধগম্য। ও পাওনা কখন যে সুরু হয় যে পায় সে-জান্‌তে পারে না। তারপর যখন একদিন জান্‌তে পারে তখন তার হৃদয়ের দুকুল বয়ে প্লাবন সুরু হয়,—আর সমস্ত জীবন ভরে তারই সুখ এবং দুঃখের লীলা চলে। সুরবালা একদিন বিয়ে সম্বন্ধে উপেন্দ্রকে একটা কথা বলেছিল—বলেছিল, আমি যে-ঘরেই জন্মাই না কেন আমাকে নিতে তোমাকে আসতেই হ'ত অর্থাৎ যে যার পত্নী হবে, সে আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে। সামাজিকের কাণে এর চেয়ে শ্রুতিমধুর কথা বোধ হয় আর কিছু নেই। কিন্তু ভালবাসা সম্বন্ধেও কি একথা সত্য নয়? সতীশ যে সাবিত্রীকে ভালবাসবে, এও আগে থাক্‌তে তেমনি ঠিক হয়ে আছে—কেউ কি ইচ্ছা করলেই কাউকে ভালবাস্‌তে পারে? বিয়ে আর ভালবাসা এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ ত কেবল সামাজিক স্বীকৃতির (Sanction-এর)—বস্তুতঃ দুই-এর মধ্যে একেবারেই এক।

এই দুই ভালবাসার পাশাপাশি আমাদের সমাজে স্বীকৃত এক চরম ভালবাসার রূপ দেখান হয়েচে—সে হচ্চে উপেন্দ্র আর সুরবালার ভালবাসা। এ ভালবাসার মোহন-রূপ অস্বীকার করবার যো নেই কিন্তু এই সম্পর্কে সমাজকে আরো একটা কথা মনে রাখ্‌তে অনুরোধ করি। মানুষ যে স্ত্রী পুরুষ ভেদে অবস্থার দাস একথা বোধহয় অস্বীকার করা চলে না। ভাগ্যিস্‌ উপেন্দ্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে হয়েছিল তাই তাদের প্রেম এমন মাধুর্য্যে মণ্ডিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। উপেন্দ্রর সঙ্গে সুরবালার বিয়ে না হয়ে যদি কিরণময়ীর বিয়ে হত তা'হলেও যে সে-প্রেম এই রকম সার্থক হয়ে উঠত, একথা হলফ্‌ করে বলা যায়। অপর পক্ষে সুরবালার সঙ্গে যদি হারাণের পরিণয় ঘটত, তবে তাদের সে-সম্বন্ধ যে গুরুশিষ্যার সম্বন্ধকে অতিক্রম করে যেতে পারত একথা জোর করে বলা শক্ত। কেননা সব প্রেমেরই সার্থকতা পরস্পরের understanding এর উপর নির্ভর করে—কোন পক্ষে তার অভাব হলেই আর পূর্ণ পরিণতি ঘটে না। এই কারণেই এ-বস্তু এত দুর্ল্লভ—আর এই কারণেই এর অমর্য্যাদা করতে নেই। উপীন-সুরবালার প্রেমকে আদৌ ছোট করে দেখ্‌চি নে—কেবলমাত্র বল্‌তে

চাইচি, এ একটি বিশেষ ঘটনার সমাবেশের ফল অর্থাৎ এই প্রেম নিয়ে যেমন উল্লাসে ঝম্প দেওয়ারও প্রয়োজন নেই, কিরণময়ী-উপীনের প্রেম নিয়ে তেমনি বিষাদে আত্মহত্যা করবারও আবশ্যকতা নেই।

উপীন আর সতীশের চরিত্রটা একটু আলোচনা করে দেখা যাক্। উপীনের ছিল বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, আর অকলঙ্ক চরিত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলি পরীক্ষা তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছিলেন। আর চরিত্রে তাঁর কেউ কোনদিন নিন্দার বাষ্পটুও আরোপ করতে পারে নি। ইনি হচ্চেন আমাদের সমাজের আদর্শের চূড়ান্ত—যদিচ এখন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর সুধীজন বিরূপ হয়েচেন। এই উপীনের চারিত্রিক শুভ্রতা এত সযত্নে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হত যে কালিমার ঘেঁস-টুকুও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। প্রমাণ যেদিন তিনি সস্ত্রীক সতীশের বাসার দরজায় এসে দাঁড়ালেন পলকমাত্র সাবিত্রীকে দেখেই তিনি ফিরে চল্লেন—এ কে, কেন এখানে এসেচে, এখানেই থাকে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন একবারও সতীশকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অথচ সতীশকে তিনি হাতে গড়ে মানুষ করেচেন, তাকে তিনি ভাল চেনেন বলে তাঁর গর্ব্বের অন্ত ছিল না। এ ভুলের জন্য তিনি পরে সতীশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, সাবিত্রীকে নিজের বোন বলে প্রচার করে ক্ষতিপূরণও করেছিলেন কিন্তু সেদিন তাঁর অত্যুচ্চ চরিত্র-গৌরব বাধা স্বরূপই হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রমাণ, দিবাকর কলেজ খোলা সত্বেও কলেজে ভর্ত্তি হয় নি, কিরণময়ীও তাকে সজাগ করে দেয় নি, শ্বাশুড়ী অঘোরময়ীও উভয়ের সম্বন্ধকে ভাল চোখে দেখেন না, এই সব থেকে তিনি ধরে নিলেন যে কিরণময়ী-দিবাকরের সম্বন্ধটা অত্যন্ত মন্দ দাঁড়িয়েচে। কিরণময়ীর দেওয়া খাবার খেলেন না, সে যখন পা জড়িয়ে ধরল তখন গালিগালাজ করে তাকে পা দিয়ে ঠেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করলেন না—এসব কি ঐ অভ্রভেদী চরিত্রগৌরবেরই দম্ভ নয়? এত অসহিষ্ণুতা কেন? অথচ আমাদের সমাজের যত যশঃ সব এই উপীনেরই প্রাপ্য। কিন্তু আমার মনে হয় উপীনের এত ভালত্ব নিয়ে সংসার চলে না। তাই যখন সুরবালা চলে গেল, দিবাকর-কিরণময়ী কঠিন আঘাত করে অজ্ঞাতবাস করলে, এক কুৎসিৎ সন্দেহের ফলে সতীশকে ত্যাগ করতে হ'ল, তখনই আমরা প্রকৃত বড় উপীনকে পেলুম। এ আর সে দাম্ভিক অসহিষ্ণু উপীন নয়—এ উপীন হচ্চে ক্ষমাশীল করুণাদ্রব হৃদয়। উপীনের অতি-ভালত্বের সঙ্গে সংসারে খানিকটা খাদ মিশিয়ে তাকে ব্যব-হারিক জগতের উপযোগী করে নিলে।

সতীশ অনেক কষ্টেও একটা পাশ করতে পারে নি—ডাক্তারী পরীক্ষাটাও শেষ করতে পারলে না। লুকিয়ে মদও খেয়েচে গানের আসরও তাদের অস্থানে হয়েচে। কিন্তু এর গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ, গান গাইতে, বাঁশী বাজাতে এর জুড়ি ছিল না, যাত্রার ষ্টেজ বাঁধতে, মড়া পোড়াতে সে ছিল অগ্রণী। পরের দুঃখে তার হৃদয় যে কত কাঁদত তার আর লেখাজোখা ছিল না—বেহারীর কথায় তার বহু প্রমাণ আছে। টাকাকে টাকা বলে কোন দিন সে গ্রাহ্য করে নি—অমন উদার ভাবে ব্যয় করতে ক'টা লোককে দেখা যায়? সাবিত্রীকে সে ভালবেসেছিল কিন্তু কোনদিন কোন ছলে, কোন সুবিধার পরিবর্ত্তেই তাকে অস্বীকার করে নি—এমন কি সরোজিনী-জ্যোতিষের সাম্‌নে কৈফিয়ৎ দিবার দিনও নয়। তার মনের কথা আর মুখের কথা কোন দিন আলাদা হয় নি। উপীন যে কালিমার ছোঁয়াচটুকু সহ্য করতে পারেন নি, সতীশ তারই মধ্যে ডুবে রত্ন আহরণ করেছিল। সাবিত্রী যে গৃহস্থকুলের বধূ নয়, সে যে সামান্য দাসী মাত্র, একথা সতীশ বুঝত না, তা নয়, কিন্তু তার প্রেমে সে তাকে মহীয়সী করে দেখেছিল। তাই সরোজিনীকে লাভ করার বদলেও সে সাবিত্রীকে ত্যাগ করতে চায় নি। আরাকানে যেদিন সে মূর্চ্ছিতা কিরণময়ীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, সেদিন সে-ঘরের কুশ্রীতা, অন্ত্যজ বাড়ীউলী, চারিদিকের বিভীষিকাময় দারিদ্র্য—কিছুই তার মনের প্রসন্নতাকে খর্ব্ব করতে পারে নি. চিরদিনের মত সহজকণ্ঠে 'বৌঠান' বলে ডেকে দাঁড়িয়েছিল। দিবাকরকে তিরস্কার করার কথাও তার মনে হয় নি, বরং দিবাকর ফিরে আসতে চায় না শুনে নিজে তার চেয়েও বেশী অত্যাচার করেচে, এই কথা বলে

দিবাকরের অপরাধকে তুচ্ছ করে দিয়েছিল। মনের এই আশ্চর্য্য উদারতা, এই পরম পবিত্র প্রসন্নতা কম শক্তির পরিচায়ক নয়! এত শক্তি ছিল বলেই সে কুলভ্রষ্টা সাবিত্রীকে ভালবাসতে পেরেছিল—কম শক্তিমান হলে পারত না। কিরণময়ীর দেওয়া উদাহরণ এই খানে মনে পড়ে। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রসঙ্গে কিরণময়ী বলেছিল যে, গোবিন্দলাল মানুষ হিসাবে হরলালের চেয়ে কোন অংশেই ছোট ছিল না কিন্তু সাংসারিক ভাল মন্দ, নিন্দা প্রশংসার কথা খতিয়ে হরলাল রোহিনীকে নিতে চায় নি, গোবিন্দলাল তাকে মাথায় করে নিয়েছিল। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অপাত্রে ভালবাসা ন্যস্ত হয়েচে শুনলেই আমাদের সামাজিকেরা যেমন চমকে উঠেন, ব্যাপারটা বাস্তবিকই তত সোজা নয়। এসব বিষয়ে অনেক কথা ভেবে দেখবার আছে। প্রশ্ন উঠ্‌বে, প্রত্যেকে এ বিষয়ে মত চালাতে গেলে সমাজ টেঁকে না। এর উত্তরে কিরণময়ী বলেছিল, এ-রকম প্রত্যেক বিষয়ে সমাজ যদি তার মত চালাতে চায় তা'হলেও মানুষ টেঁকে না। কথাটা খুব সত্য। বুঝি আমাদের সমাজ ভেঙ্গে গেল, এই ভয়ে আমরা সর্ব্বদা আড়ষ্ট হয়ে আছি। মানুষ টেঁকে কি না, এ-কথাটা কোন দিনও ভেবে দেখলুম না। কিন্তু আজ সেকথা ভেবে দেখবার দিন এসেছে। আজ মানব-মনের সাম্‌নে এই প্রশ্ন জেগেচে যে সতীশ বড় কি উপীন বড়, ভালবাস্‌তে পারার ক্ষমতা বড়, কি ভালবাসার উপর পদাঘাত করার ক্ষমতা বড়!

কিরণময়ীর চরিত্র এক পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি—এরকম স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ না পেলে, কিম্বা নিজের মধ্যে কিরণময়ীত্বের অনুভূতি না জাগলে ও-চরিত্র বোঝাই যায় না, বিচার করা ত দূরের কথা। খুব ঝোঁকের উপর কাজ করা যে তার অভ্যাস ছিল এটা বোঝা শক্ত নয়। প্রথম রাত্রে বাড়ী-ঘর দোর উপীন সব লিখে দেবেন কল্পনা করে সে কি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, শিষ্টাচার না মেনে কি রকম কলহে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সকলেরই মনে পড়বে। রূপ এবং বুদ্ধি বিধাতা তাকে পুরোপুরিই দিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন অদম্য জিগীষা। পূর্ব্বেই বলেছি মানুষ অবস্থার দাস। এ হেন রূপ-গুণসম্পন্না নারীর বিয়ে হ'ল যাঁর সঙ্গে, তিনি ভালবাসার কোন ধার ধারতেন না। তিনি নিজে ছিলেন নাস্তিক, স্ত্রীকেও নিরীশ্বরবাদিনী করে তুললেন। কিরণময়ী মামার বাড়ীতে মানুষ, সেখানে স্নেহের মুখ দেখেনি। শ্বশুর বাড়ীতে স্বামী পড়িয়ে খুসী হতেন, খাশুড়ী নির্য্যাতন করে খুসী হতেন। ফলে নারীর কোমল বৃত্তিগুলি কোন দিনই বিকশিত হবার অবকাশ পেল না, অপর পক্ষে বুদ্ধির প্রাখর্য্য বেড়ে উঠ্‌ল। সুরবালার এবং উপীনের দাম্পত্য প্রেমের কাহিনী শুনে সে স্বামীকে ভাল-বাসতে চেয়েছিল কিন্তু তখন too late—তার স্বামী সেবাও ছলনা নয়, আবার উপীনকে ভালবাসাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সে ছিল অত্যন্ত দর্পিতা রমণী—উপেন্দ্রের নিষ্ঠুর অপমান, নিঃসঙ্কোচ পদাঘাত তাকে একেবারে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করেছিল। সেই তীব্র অপমানে যে জিঘাংসাবৃত্তি জেগে উঠেছিল তার ফলে নিজের কোন দুর্গতিই তখন আর তার অকরণীয় ছিল না। উপেন্দ্রের নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতাকে রাহুগ্রস্ত করাই তখন ছিল তার লক্ষ্য। উপেন্দ্র বলেছিলেন ভাল-বাস্‌লে কি কেউ এতটুকু ব্যথা দিতে পারে—সে হাত্‌ড়েই বেড়িয়েছে, কোন দিনই কিছু পায় নি। এ-ও সত্য। এই খানেই কিরণময়ীর চরিত্রের ট্রাজিডি। সে বারে বারে পথভ্রান্ত হয়েচে। কিন্তু ভালবাসবার শক্তি তার কোন রমণীর চেয়েই কম ছিল না।

সুরবালা একটি জলন্ত বিশ্বাসের চিত্র। তার বিশ্বাস এবং সরলতা তাকে অজেয় করেছিল। প্রখর বুদ্ধিশালিনী কিরণময়ীও একদিন সেই বিশ্বাসের পায়ে আত্মসমর্পণ করে ধন্য হয়েছিল। বিশ্বাসের এমন একটা স্তর আছে যেখানে সে সমস্ত বুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায়। সুরবালা কোমলতারও প্রতিমূর্ত্তি।

সাবিত্রীর নাম অত্যুক্তি নয়। ভালবাসলে যে কি রকম অত্যাশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ করা যায় সাবিত্রীই তার প্রমাণ। সতীশের পরম হিতই সে চিরদিন আকাঙ্খা করেচে—সতীশকে রক্ষা করার জন্য, তার ঘৃণা, উপেক্ষা লাভ করার জন্যে সে মিথ্যা নিন্দা, অপযশ বরণ করে নিয়েছিল কিন্তু তবু সফল হয় নি। সতীশের স্নেহের আগুনে সব পুড়ে

গিয়েছিল। এই রকমই হয়। তাই এদের প্রেমের কাহিনী মনকে এত স্নিগ্ধ করে। সাবিত্রীর ত্যাগ এবং ধৈর্য্য অতি বড় শিক্ষিতাভিমানী রমণীকেও লজ্জা দিয়েচে। সুতরাং তার প্রেমকে আর ছোট করে দেখবার উপায় নেই। উপেন্দ্র যে তাকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন—তিনি আর তাঁর বোন সাবিত্রী কোন দিন জগতে ছোট কাজ করেন নি, এ একেবারেই অতিরঞ্জন নয়।

আমার মনে হয় শরৎবাবুর চরিত্রহীন বোঝবার মত মনের অবস্থা এখনো আমাদের হয় নি। সর্ব্ববিধ সংস্কার থেকে মনকে মুক্ত করতে না পারলে এ উপন্যাসের রসোপলব্ধি হয় না। শরৎবাবু বলেচেন যে, মানুষের ত্রুটি, বিচ্যুতিই তার একমাত্র নয়—তার মানবতা এ সকলের চেয়ে বড়। তিনি আরো বলেচেন যে কোন স্ত্রীলোককেই তিনি অসতী বলে মনে করতে পারেন না—তারা যেন একটা মুখোস পরে আছে মাত্র—ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্ত্তে এই মুখোস খুলে ফেল্‌তে পারে। এই সব কথাগুলি মাঝে মাঝে অনেক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা হয় দেখ্‌তে পাই কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনের উপর এদের কোন effect নেই তার প্রমাণ পেয়েচি। এর কারণ theoretically ভাল-লাগা এক, আর এই sentimentকে উপাদান করে জীবন গঠিত করে তোলা আর। তাই অতি সহজে এসব কথাগুলি মুখস্থ হলেও ধাতস্থ হয় না। এখনো আমাদের সমাজে বিবাহের ধ্বজা সু-উচ্চে উচ্ছ্রিত—বিবাহের পবিত্রতার সংস্কার আমাদের মনকে আঁকড়ে বসে আছে। প্রতি বিবাহেই প্রেমের আদান-প্রদান হয় এটা মেনে নেওয়া হচ্চে। অপর পক্ষে বিবাহের দ্বারা সুপবিত্র নয়, এমন সব ভালবাসাই দণ্ডনীয়——এটাও স্বীকার করে নেওয়া হয়েচে। কিন্তু খুঁজে দেখতে গেলে হয়ত শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে যে, বিবাহিত জীবনে মমতাকে ভালবাসা বলে ভুল করা হচ্চে। এই সব ছোট এবং বড় সংস্কার মন থেকে অন্তর্হিত না হলে 'চরিত্রহীনে'র বিচার সম্ভব নয়। সাবিত্রী সতীশের মত ভালবাসা এতকাল আমাদের সমাজে ঘটে থাকলেও তাই নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়নি—এমন অপাংক্তেয় বস্তু উপন্যাসের উপকরণ যোগাতে পারে, একথা কারুর মনে হয় নি। আর তার একমাত্র কারণ (শরৎ বাবুর কথায়) ভালবাসার নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যিকার অধিকার সেই রকম দু'চারজন হতভাগ্যেরই জন্মায়, দুঃখের কারবারে যাদের ভরাডুবি হয়ে গেছে!

———

মানব

শ্রীশিশির ঘোষ

বসন্তের পুষ্পবন ফুল্লহাসিরাশি
থাকিবে না চিরদিন, লইবে বিদায়
মুকুতা মলিন করা পূর্ণিমার হাসি,
আঁধারের বুকভরা সুতীব্র ক্ষুধায়।
কোকিলের কুহু-কুহু মধুকণ্ঠরব
থেমে যাবে একদিন, বৈশাখ দুপর
আপনি পুড়িয়া নিজে করে দিবে সব
শ্মশানের ভস্মরাশি—আরো তুচ্ছতর।

বরষা শুকায়ে যাবে কোন একদিন,
শীতের শীকরসিক্ত শুষ্ক পরশনে,
সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে ছিঁড়ে যাবে বীণ,
জীবনে চলার পথে, মৃত্যু আলিঙ্গনে।
জানি যাবে একদিন, ধরণীর মাঝে,
কালের নির্ম্মম হাতে,—যাহা আছে সব,
তবু আমি রব বেঁচে বর্ত্তমান মাঝে
মৃত্যুহীন মরণেরে দানি পরাভব।

তোমাকে

শ্রীপ্রণব রায়

জীবন-পথে জনতা মাঝে চলিতেছিনু একা ;
সহসা কবে উষর পথে ফুটিলো নবতৃণ,
মাধবী-দূতী বনানীশাখে বাজালো কুহু-বীণ্ ও,
ক্ষণেক তরে নীরবে হোল তোমারি সনে দেখা !

ক্ষণিক দেখা—নমিত তব নয়ন দু'টি তুলি'
চাহিলে তুমি পথিকসখি, আমারি মুখ'পরে,
মুদিত মনোমুকুল মম নয়নারুণকরে
মেলিলো ধীরে পরাগরেণুসুরভি দলগুলি ।

আজিকে তুমি হারায়ে গেছ জনতা-কোলাহলে,
মরুভূ-বুকে মিলায়ে গেছে শ্যামল মরীচিকা,
জ্বলিছে খরতপনতাপে দারুণ দাহশিখা,
স্মিরিতি তব অস্তগত অতীত-তমোতলে ।

ভুলিয়া গেছি—তবুও ডাকি ধরিয়া শত নাম,
তোমারে খুঁজি সবার মাঝে সর্ব্ব কালে-দেশে ;
বিকচ মম হৃদয়টিরে তোমারি উদ্দেশে
পান্থ যত সবারি হাতে আজিকে সঁপিলাম !

রক্তের রঙ্গ

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সেই নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া কপিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। যেন এইবার সে পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিবে। কোনও দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। যাহাকে এই মুহূর্ত্তে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে তাহাকে পৃথিবীর কোথাও ফেলিয়া আসা যায় না তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিল। সে যত ছুটিতেছে, তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া নূরের পদধ্বনি যেন ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। মুক্তি? মুক্তি কি এই? রক্তাক্ত হৃদয় তাহার, রক্তাক্ত পদদ্বয়—কিন্তু কোনও দিকে চাহিবার তাহার ইচ্ছা নাই, শক্তি নাই। শুধু ছুটিয়া চলিয়া যেন আরাম—থামিতে তাহার ভয় করিতেছিল। শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রিশেষে সে যে কোথায় কখন আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়িল না। ভোরের পাখী গাছের ডালে বসিয়া ডাকিতেই তাহার গভীর নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল—আবার সেই ভয়। কোথায় কোন্ লোভে সে জড়াইয়া পড়িবে, কোন্ মোহে আবার আপনাকে বিলাইয়া দিয়া বসিবে, কোন্ ভালবাসার বিন্দুটুকুর জন্য আবার কাঙ্গালের মত ঘুরিয়া মরিবে এই তাহার ভাবনা হইল। নিজেকে বাঁচাইতে কতবার সে চেষ্টা করিয়াছে, কতবার অশ্রুর বন্যায় বক্ষের রক্ত ধুইতে ধুইতে মনে মনে আর্ত্তনাদ করিয়াছে—আর নয়—নারী তুমি ভাগ্যবতী, তুমি ঐশ্বর্য্যময়ী, তুমি লক্ষ্মী; আমাকে তোমার দিকে আর টানিও না, আমাকে আর অসম্ভবের আশায় ডাকিও না, সর্ব্বনাশের জয়মাল্য আমার দুর্ব্বহ বোঝা হইয়া উঠিয়াছে—আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে ভুলিয়া যাও। পাষাণি, আমি মৃত, কপিলের কঙ্কাল আমি—ক্ষণিকের ভিক্ষায় আমার আত্মাকে আর অপমান করিও না।

কিন্তু কপিল পারে নাই। তাহার কাঙ্গাল প্রবৃত্তি তাহাকে শতবার নারীর দিকেই টানিয়াছে—সব হারাবার একান্ত নিঃসঙ্গতা লইয়া নিজেরই মধ্যে আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

আজও তাহাই। সেই কপিল, সেই একা কপিল। ভয়ে সে আনন্দকে গ্রহণ করিতে পারে না। আগুন ধরিয়া কতবার তাহার গৃহদাহ হইয়াছে!—কপিল আজও দেখিতে লাগিল তাহার চোখের সম্মুখে রাতের বাসাটুকুতে তাহার আগুন ধরিয়াছে। তাহারই রক্তাভ আভায় সীমান্ত যেন লাল হইয়া উঠিয়াছে।

কপিল চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—তারা কই? যারা দিনের পর দিন বুকে মাথা রাখিয়া বলিয়াছে, তোমাকে পাইয়া ধন্য হইলাম, নিজেকে তোমার মধ্যে হারাইয়া প্রেম ধন্য করিব, ঈশ্বরের বিশ্বরূপ ধন্য করিব; কই, তারা কই!

অশান্ত মন, শ্রান্ত দেহ—প্রভাত হইয়াছে, কাজে যাইতে হইবে। কিন্তু কি হইবে যাইয়া? কাজ? কাজ কাজ করিয়া নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছে কিন্তু রক্তাক্ত হৃদয় তাহার রক্তজবার মতই সবার উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

আমি নিরুপায়, আমি অক্ষম—আমাকে বাঁচাও প্রভু!—

বলিয়া কপিল চীৎকার করিয়া উঠিল। গাছের ডাল হইতে পাখী উড়িয়া পলাইল।

কপিলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। কপিল কাহাকে যেন দেখিতে পাইবে এমনি একটা প্রতীক্ষার দৃষ্টি তুলিয়া সে পূর্ব্বাচলের দিকে তাকাইয়া রহিল। বুঝিবা দেবতা প্রভাতের এই নির্ম্মল আলোর রথে তাহারই চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন! দেবতা তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়াছেন, এই তাহার অটল বিশ্বাস—না শুনিয়া তিনি পারেন না। তাঁহাকে কিছু করিতেই হইবে—যদি ব্যথাতুর অন্তরে এমনি সময়ে দেবতার স্পর্শ না পাওয়া যায় তবে দেবতা থাকিয়া লাভ কি!

কপিল চাহিয়া রহিল। দূরে, অতি দূরে, পূর্ব্ব সীমান্তের প্রান্তরের অপর পার হইতে যেন কাহার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। কপিল চক্ষু মুদিল। এই বুঝি তাহার সেই—যাহার কাছে কোনওদিন কিছুই গোপন রাখে নাই, যাহার কাছে তাহার লজ্জা, অহঙ্কার, ভয়, নীচতা কিছুই অবিদিত নাই—সে আজ আবার আসিল বুঝি! কপিল চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—তাহার পায়ের ধ্বনি কাছে আসিতেছে, খুব কাছে আসিয়া না জানি সে কি করিবে? কপিল অঝোরে কাঁদিতে লাগিল।

যখন কপিলের জ্ঞান-সঞ্চার হইল, তখন সে প্রথম চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘন বনে আচ্ছাদিত একখানি জীর্ণ কুটীর, তাহারই মধ্যে সে শুইয়া আছে। এতো তাহার নিজের ঘর নয়! তাহার আর জানিতে ইচ্ছা হইল না, সে কোথায় কেমন করিয়া আসিল। কাহাকেও পাছে দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে সে আবার চোখ বুজিল।

পিছন হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন লাগ্‌ছে কপিল?

কপিল উত্তর করিল না।

কপিল বুঝিতে পারিল লোকটি কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কপিল জোর করিয়া চোখ চাপিয়া রহিল।

আবার প্রশ্ন—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে?

কপিল অনিচ্ছায় এবার চোখ খুলিল। এ কি! এ যে অশোক। তেমনি এলোমেলো লম্বা চুল, তেমনি ছোট দুটি চোখ জল্‌ জল্‌ করিতেছে, তেমনি কঙ্কালসার দেহ—তেমনি সব—শুধু বয়স তাহার একটু বাড়িয়াছে। কপালের রেখা গুলি একটু গভীর হইয়াছে, চাপা ওষ্ঠাধর নীচের দিকে একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে, নাকের দুইপাশ হইতে দুইটি গভীর রেখা মুখের দুই পাশ দিয়া নামিয়া গিয়াছে।

কপিল বিস্মিত হইয়া অশোকের দিকে চাহিয়া রহিল।

অশোক তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, গরম দুধ আর কিছু ফল আছে, খাবে?

কপিল এতক্ষণ ক্ষুধা অনুভব করে নাই। তাহার যে নিজের কোন অস্তিত্ব আছে, তাহা যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। অশোকের কথায় তাহার মনে পড়িল—কবে একদিন রাত্রে সে অন্ধকারের ভিতর দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আর আজ সে এখানে।

অশোক কোনও উত্তর না পাইয়া কপিলের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার চোখের দিকে চাহিল, তারপর একটু উচ্চ স্বরেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কিছু খেতে ইচ্ছা করছে কি?

কপিল একটু মৃদু হাসিল। হাত তুলিয়া একবার নিজের মাথায় বুলাইয়া লইয়া বলিল, কি ভাবছ? পাগল হয়েছি? পাগল হইনি অশোক।

অশোক শুধু বলিল, তা আমি জানি। বলিয়াই পাশের একটা দরজা দিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

কপিল ভাবিল, এ-ত বড় আশ্চর্য্য! এত দিন পরে দেখা হইল অশোক একটা কথা বলিল না!

কপিল আবার চোখ বুজিয়া রহিল। একটু পরেই তাহার মনে হইল কে যেন আবার তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তৈল মার্জ্জিত কেশের সুবাস ঘরের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু কথা বলিল অশোক।

—লক্ষ্মী এসেছে খাবার নিয়ে। কপিল ওঠ।

কপিল পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, এখন কিছু খেতে পারব না।

আশ্চর্য্য! অশোক একটুও সাধিল না, লক্ষ্মীও না।

চুপ করিয়া পড়িয়া থাকতে থাকিতে কপিল ঘুমাইয়া পড়িল।

একবার দুপুরে ঘুম ভাঙ্গিয়া হঠাৎ চোখ খুলিয়া ফেলিয়াছিল। চারিদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। একবার ঘুমাইয়া একবার জাগিয়া কখন রাত্রি আসিয়া পড়িল। একবার চোখ খুলিয়া কপিল দেখিল, কোণে একটি তেলের প্রদীপ কে জ্বালিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

একবার ইচ্ছা হইল অশোককে ডাকে। কি ভাবিয়া আবার চুপ করিল। ভাবিতে লাগিল, লক্ষ্মী? লক্ষ্মী কে? কোথায় সে? একবারও ত সারাদিনে তাহাকে দেখা গেল না!

অশোক ঘরে ঢুকিল। ঘর্ম্মাক্ত দেহ।

কপিল জিজ্ঞাসা করিল, সারাদিন কোথায় ছিলে?

অশোক বলিল, সহরে গিয়েছিলাম।

কপিল জিজ্ঞাসা করিল, সহর মানে?

অশোক হাসিয়া বলিল, আমি জঙ্গলে থাকি তাই গ্রামে গেলেই আমি তাকে বলি সহর। এই নির্জ্জন জনবিরল অরণ্য থেকে গ্রামে গেলে সহরে এসেছি বলেই মনে হয়। —লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

কপিল মাথা নাড়িল। বলিল, কে লক্ষ্মী?

অশোক বলিল, মনে নাই! তোমার কাছে যার গল্প করতাম। সেই অন্নদাবাবুর মেয়ে সরযু! এখানে এসে তার নাম হয়েছে লক্ষ্মী। সরযু কিন্তু সত্যি লক্ষ্মী হয়েছে।

কপিল বলিল, মনে পড়েছে। সরযু—তোর সেই সরযু।

অশোক জোরে হাসিয়া উঠিল। ডাকিয়া বলিল, লক্ষ্মী, শুনছ কপিল কি বল্‌ছে?—আমার সেই সরযু!

ডাক শুনিয়া নয়, আগেই সরযু ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল। হাসি শুনিয়া সে একটু থমকিয়া গিয়াছিল্। অশোক তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কপিলের বিছানার উপর বসাইয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল, বল ত লক্ষ্মী, তুমি কি আমার সেই সরযু?

অশোকের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া লক্ষ্মী ধীরে গিয়া কপিলের পাদস্পর্শ করিল। অস্ফুট স্বরে বলিল, এঁদের কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

কপিল শ্রদ্ধাভরে দুই হাত জোড় করিয়া প্রতিনমস্কার জানাইল। তারপর একটু উঠিতে চেষ্টা করিয়া, না পারিয়া বলিল, আমি কি উঠে বসতে পারি না? আমি শুয়ে আছি কেন?

অশোক বলিল, আমি ধরে বসিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিজে চেষ্টা করো না। দাও ত লক্ষ্মী ওর পিঠের কাছে বালিশ গুলো ঠিক করে!

উঠিয়া বসিতেই কপিলের মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। চারিদিক দেখিতে দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল—কপিল ঢলিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি লক্ষ্মী কপিলকে ধরিয়া ফেলিল।

অমনি করিয়াই সারারাত্রি কাটিয়া গেল। ঠায়ে বসিয়া কপিলের মাথাটি বুকে করিয়া লক্ষ্মী সারারাত্রি জাগিয়া রহিল। একটু নড়িতেও সাহস করে নাই। অশোক কেবল বিছানার পাশে বসিয়া কপিলের মুখের দিকে তাকাইয়া কাটাইয়াছে।

ভোরের দিকেও কপিলের জ্ঞান সঞ্চার হইল না।

লক্ষ্মী বলিল, যাও, একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস।

অশোক চুপি চুপি বলিল, তুমি ত জান লক্ষ্মী, তা পারি না।

লক্ষ্মী উপায়ন্তর না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে?

অশোক একটু ভাবিয়া বলিল, আপাততঃ আমিই দেখি, ক'দিন। তাতে যদি না হয় তখন যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রায় সপ্তাহখানেকের পর কপিল একটু ভাল হইয়া উঠিল। অশোকই তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত। তবে অশোক বুঝিতে পারিয়াছিল সত্যিকারের ঔষধ অপেক্ষা একটা ঔষধ খুব কাজ করিয়াছে। সেটা অশোকের গল্প। কপিল সন্ধ্যার পর হইতে বসিয়া বসিয়া কেবল গল্প শুনিয়া যায়। অশোকের গল্প—কেমন করিয়া কোথা দিয়া আজ সে অরণ্যবাসী গৃহী হইয়াছে তাহারই কাহিনী। বিস্ময়, রস ও কৌতুহলে ভরা! গল্প সাজাইয়া বলিবার অশোকেরও

একটা শক্তি ছিল। লক্ষ্মী ঘরের কাজ করিতে করিতেই মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের মাঝখানে বসিত।

এমনি করিয়া আরও কয়দিন কাটিয়া গেল। অশোক একদিনও জিজ্ঞাসা করে নাই কপিলের কথা। কপিলও জিজ্ঞাসা করে নাই অশোক এখন কি কাজ করে।

একদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রোজকার মত অশোক আসিয়া কপিলের কাছে বসিল।

কপিল মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকের কাগজে কি লিখছে?

অশোকও বেশ করিয়া চাপিয়া বসিয়া কাগজ পড়িবার মত দুইখানি হাত চোখের সাম্‌নে তুলিয়া পড়িবার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল—

"কপিল নামে এক ব্যক্তি কিছুদিন হইতে ফেরার হইয়াছে। তাহার সন্ধান না পাওয়াতে কয়েক ব্যক্তি বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই কপিল বলিল, ওসব ঠাট্টা ছাড়।

অশোক বলিল, ঠাট্টা নয়। আলি বলে' কোনও লোককে তুমি চিন্‌তে?

কপিল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

অশোক বলিয়া যাইতে লাগিল, তোমার কথামত বিকেলে ফেরবার পথে তোমার কাপড়-চোপড় আন্‌তে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা আলির সঙ্গে। সে তোমাকে একদিন দেখ্‌তে আস্‌তে চায়। তোমার কি আদেশ?

লক্ষ্মী কপিলের মুখের দিকে চাহিল। কপিলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

লক্ষ্মী বলিল, ভাল কথা। আজ আমাদের বাড়ীর কাছে এক ভদ্রলোক শীকারে এসেছিলেন। মনে হোল বেশ পয়সাওয়ালা লোক। সঙ্গে অনেক লোক জন। লোকটি সৌখীন—বয়সও অল্প।

অশোক হাসিয়া বলিল, যাহোক্ তোমাকে যে শীকার করে নিয়ে যায় নি এই রক্ষে। তাহলে আমার বিপদ হোত।

লক্ষ্মীও হাসিয়া বলিল, প্রায় তার ব্যবস্থা করে তুলেছিলেন লোকটি। আমার হাতে জল চেয়ে খেয়ে গেছেন। আমার মনে হোল রাবণ না জানি আবার ভিখারীর বেশে এল!—বলিয়াই সে খুব জোরে হাসিয়া উঠিল। গল্পের ঝোঁকে কেহ কপিলের দিকে লক্ষ্য রাখে নাই।

দুই জনেই এক সঙ্গে ফিরিয়া দেখিল, কপিল শুইয়া পড়িয়াছে। মুখের উপর ক্লান্তির একটা বিবর্ণ ছায়া।

—ক্রমশ

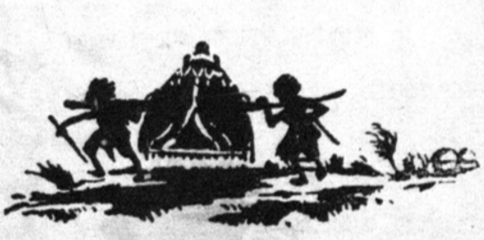

ভবিষ্যৎ

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

যদি কোনোদিন আমি দুখের ঝঞ্ঝায়
বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ি বনস্পতি প্রায়,
বিধাতারে অভিশাপ দিব না দিব না,
আপনারে ধিক্ ধিক্—সে-ও বলিব না।

তখন স্মরিব তোমা হে আমার লতা,
নিশিদিন যে সৌভাগ্য দিয়েছ সর্ব্বথা।
এত সুখ দিলে তুমি—নিজ হ'তে দিলে,
এত কাঁদাইলে তুমি, সুখে কাঁদাইলে!

এর পরে আসে যদি আসুক ঝটিকা,
স্বহস্তে মুছিয়া দিক চুম্বনের টীকা!
তুলে নিক্ পুলকের দুর্ব্বহ সম্ভার,
তৃপ্তি হতে মুক্তি দিয়া করুক সংহার।

ধন্য করিয়াছ প্রাণ হে আমার লতা,
প্রাণ দিয়া জানাইব প্রাণের ধন্যতা।

চলচ্চিত্র

ডি-আর

এবার আমি Film-এর Scenario সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে চাই। বিষয়টি এত জটিল যে সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় তার সম্পূর্ণ আলোচনা হতে পারে না। এখানে হয়ত বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের দেশে ভাল Scenario-র খুব অভাব। Scenarist-এর হাতে ছবির ভাল মন্দ অনেক খানি নির্ভর করে একথা সকলেই বুঝি। কিন্তু শক্তিমান ও অভিজ্ঞ Scenarist-এর অভাবে আমাদের ছবির Production অন্য সব দিক দিয়ে ভাল উত্‌রে গেলেও গল্পের দিক দিয়ে মার খায়। ছবি দেখে সবাই গল্পের অনুক্রম ও প্রসার সম্বন্ধে ত্রুটি উল্লেখ করেন। এর কারণ Scenario-র ত্রুটি!

আপাততঃ আমাদের দেশে প্রায় Producing কোম্পানাই কোনও প্রসিদ্ধ লেখকের উপন্যাস বা নাটককে রূপান্তরিত করে ছবি তোলেন। ব্যবসার দিক দিয়ে তার একটা প্রয়োজন আছে। নামজাদা লোকের লেখা না হলে লোকে ছবি নেয় না এ কথা জানা গেছে। তাই প্রসিদ্ধ লেখক ও বই নিয়েই প্রথমটা কাজ করতে হচ্ছে। তাতে অসুবিধা এই হয় যে, যিনি দৃশ্যলিপি (Scenario) লেখেন তিনি পুস্তকের ভাষা ও বর্ণনায় এত অভিভূত হয়ে পড়েন যে, মূল বই থেকে বিশেষ কিছু বাদ দেওয়া তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মনে হয় এটা বাদ দেওয়া যায় না, এই কথাটি অপূর্ব্ব এই ভাবটি চমৎকার - এই রকম করে মূল আখ্যানকে তাঁরা বড় জটিল করে ফেলেন। Scenario-র প্রথম জিনিষ—গতিশীলতা। তার মধ্যে একটি প্রধান স্রোত থাকবে—আশে-পাশের ঘটনার আকর্ষণে এই মধ্যগতি বেগবতী হওয়া ভিন্ন যেন কোনও রকমে ব্যাহত না হয়।

Film এর প্রাণ হচ্ছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বা action-কেই প্রধান সহায় করে Scenario নির্ম্মাণ করা দরকার। সামান্য একটু ঠোঁটের কাঁপুনি—একজনের মনের অবস্থা প্রকাণ্ড একটা ইতিহাস বলে দেয়। Scenario-তে এর স্থান অনেকখানি। তবে সাধারণ হাবভাবের চাইতে ছবিতে হয় ত action একটু বেশী দেওয়া দরকার। Film-এ বিষয়-বিবৃতিই প্রধান বিষয়। যিনি Scenario লিখবেন বা লিখতে প্রবৃত্ত হবেন তাঁর পক্ষে Camera shot বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ দরকার। দৃশ্যলিপিকারকে লেখবার সময় সমস্ত ছবিটি চোখের সাম্‌নে দেখতে হবে। কেমন করে কোন্ জিনিষটা ফুটে উঠ্‌বে, যেন তিনি নিজে ছবি দেখছেন এই ভাবে অনুভব করতে হবে। তাঁকে মনে রাখ্‌তে হবে দর্শকরা ছবি অবলম্বন করেই সমস্ত বিষয়টি বুঝবে। সেখানে উপন্যাসের লেখকও থাক্‌বেন না—দৃশ্যলিপিকারও থাক্‌বেন না। ভাষাও কারুর মুখে নেই যে কোনও কথা বুঝিয়ে দেবে। এক আছে Titles আর Captions তবে; এগুলি ছবিতে বেশী পরিমাণে থাক্‌লে ছবিকে ম্লান ও জটিল করে ফেলে। সেই জন্য Titles যত এড়ান যায় ততই ভাল। তা বলে অত্যাবশ্যক স্থানে তার অভাবও তেমনি ক্ষতিকর। অভিনয় নৈপুণ্য ও ঘটনা সমাবেশ দ্বারা এই টাইটেলকে অতিক্রম করতে হয়। যা অভিনয় দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব এবং যা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করলে অভিনয় ও বর্ণনা জোরালো হয় তারই জন্য টাইটেলের দরকার। নতুবা, যদি সম্ভব হয়, টাইটেল বর্জ্জন করাই বিধেয়।

কি ভাবে এই সিনারিয়ো লিখতে হয়—তার একটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব।

সিনারিয়োর ভিতরে Camera Shots উল্লেখ থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যে ছবি দৃশ্যলিপিকার ফোটাতে চান্ তার কোন্ অংশ কি ভাবে ছবি নিলে সম্যক ফুটে উঠবে তার একটা ইঙ্গিত লিপিকারকে দিতে হয়। তাই তাঁর

Camera angle ও তার ফলাফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

তারপর হচ্ছে ক্রিয়া বা action সম্বন্ধে নির্দ্দেশ। কি ভাবে কি অবস্থায় কে কি করবে এ বিষয়ে বর্ণনা থাকা প্রয়োজন।

তারপর ক্রিয়া—অর্থাৎ action-টা কি? কি করবে অভিনেতা?

কি করবে ও কি অবস্থায় সে ঐ action দেবে এই দুইটি ভিন্ন ভাবে লেখা থাকা চাই। যথা—একটি ছেলে খুব হাসছে! এ কথা বল্‌লে কিছু বোঝা যায় না। এই হাসিটা তার কি থেকে উৎপন্ন হোল এবং সে কতখানি কি ভাবে হাসবে তা' বিশদ ভাবে বিবৃত থাকা দরকার।

এই সিনারিয়ো সাজাবার একটা প্রথা আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে একটা গল্পাংশ ধরা যাক্।

একটি লোক চাকরীর সন্ধানে পথে পথে ঘোরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে বিফল মনোরথ হয়ে তার আবাসে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

এইটুকুর মধ্যে কতগুলি আছে বাইরের দৃশ্য;—যথা পথ, তার বাড়ীর দরজা ইত্যাদি—এগুলির নাম Exterior Scenes; তারপর হচ্ছে ঘরের ভিতরকার দৃশ্য—তাকে বলে Interior Scenes.

এখন ধরা যাক—কি ভাবে সাজান হবে। Exterior—ঘরের দরজার সম্মুখ—

১। তার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে কোথায় যায়। তার মুখে নিরাশার চিহ্ন। হঠাৎ যেন তার মনে আশার সঞ্চার হোল। সে পথে নাম্‌লো।

এইটুকুকে Camerar angle ও দূরত্বে ভাগ করতে হবে।

১। Long Shot—ছেলেটি দাঁড়িয়ে দরজার সম্মুখে।

২। Close up—ম্লানমুখে ভাবছে। হঠাৎ মনে যেন আশা এলো—মুখ চোখ তার ক্ষীণ আশায় ভ'রে উঠ্‌লো।

৩। Middle shot—সে পথে নাম্‌লো ও এগোতে লাগ্‌লো।

তারপর পথের কিছু দৃশ্য। যে পথে সে চলছে—তার জনতা, গাড়ী ঘোড়া বাড়ী বা কোনও বিশেষ দৃশ্যের অংশ।

১। Long shot—পথ, জনতা গাড়ী ঘোড়া ফেরিওয়ালা, দোকান-পাট ইত্যাদি—সে চলছে ফুটপাথ ধরে।

এখানে গল্প জমাবার জন্য দুই একটা দৃশ্য দেওয়া প্রয়োজন। যথা—সে চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌ল—একটা আপিসের বাবুরা দলে দলে আপিসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

একটু দেখিয়েই তার তখনকার মনের অবস্থা দেখান দরকার। এটুকু middle shot-এ তার মুখ প্রধান বিষয় করে ছবি নিতে হয়।

তারপর আবার সে চলেছে নিরাশ হয়ে—Long shot.

সংশয় ভয়ে সে একটা আপিসের দরজায় ঢুক্‌ল।

Exteiror—আপিসের দরজা। দারোয়ান বসে—সে ঢুক্‌ছে। middle shot.

দারোয়ান মানা করল—তার চেহারার দিকে তাকাল। দারোয়ানের মুখের ভাব ও তার নিষেধাজ্ঞা। Close up.

তার মুখের চেহারা—Close up.

Long shot— সে হতাশ হয়ে ফিরে চল্‌ল।

Long Shot—সন্ধ্যা হয়েছে—লোকজন গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরছে—সেও তার মধ্যে চলেছে।

Close up—তার মুখের ভাব।

Middle Shot—তার বাড়ীর দরজা, অন্ধকার। সে গিয়ে দাঁড়াল। তার পিঠের ওপর পথের আলো পড়েছে। দরজা ধরে ফিরে দাঁড়াল—পকেট হাত্‌ড়ে কয়টা পয়সা বের করল।

Close up—হাতে পয়সা ক'টার দিকে চেয়ে আছে। অন্য হাতে চারটে পয়সা একদিকে সরিয়ে রাখ্‌ল। বাকী কয়টা পকেটে ফেল্‌ল। একটা দীর্ঘশ্বাস। আবার পথে নাম্‌ল।

এর ভেতর আরও ভাগ আছে। সেগুলি আর আপাততঃ এখানে উল্লেখ করা হোল না।

আমার মনে হয় আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই দৃশ্যলিপি লিখ্‌তে প্রবৃত্ত হলে খুব ভাল হয়। এখন সত্যই ভাল দৃশ্যলিপিকারের অভাব। অথচ ভাল Scenario লিখ্‌তে পারলে তার জন্য বেশ ভাল দাম পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

একখানি নাটক

একখানা মাত্র বই লিখে এ পর্য্যন্ত জগৎ-জোড়া প্রতিষ্ঠা লাভ যাদের ভাগ্যে জুটেছে, সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশি নন। বর্ত্তমান কালে রিমার্ক (Herr Erich Maria Remarque) এবং 'পথ-যাত্রার শেষ'-এর রচয়িতা ছাড়া আর কাউকে অতদূর খ্যাতি লাভ করতে দেখা যায়নি। মানুষের সৌভাগ্যের সিংহদ্বার যে কখন কি ভাবে খুলে যায়, সেকথা আগে কিছুতেই অনুমান করা যায় না। 'পথের শেষে'র রচয়িতার সম্বন্ধেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বিলেতের এক অখ্যাতনামা ইন্‌সিওরেন্‌স্ আপিসের সামান্য কেরানী, জীবনের কোনো বড়ো আশা আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হওয়ার ভরসা নেই, কাজেই উৎসাহ ও উদ্যম সেই অনুপাতেই কম। তবু সমস্ত দিনের হাড়-ভাঙ্গা খাটুনীর পরে রাত্রির নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে, মনের গোপন আঁধারে যে-কল্পনা ও ভাব নিঃশব্দে পদচারণা ক'রে বেড়াতো, সে-সবকেই রাত্রির পর রাত্রি ধরে তিনি কাগজের বুকে বন্দী করে রাখতেন। এই রচনাবলীই ক্রমে নাট্যরূপ লাভ করে। লিখ্‌তে লিখ্‌তে এক এক সময় নিজেরই অরুচি ধরে যেতো, বিরক্তি বোধ হতো; মনে হোত—কাজ নেই এসব ছেলেমানুষীতে, মিছামিছি লোকের হাসি ও ব্যঙ্গের উপকরণ কুড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু তখনি আবার এই বলে' নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন যে, এতে তো কারোই ক্ষতি নেই! এ আমার নিজস্ব একটি বিলাস; লিখে যদি আনন্দ পাই, তাহ'লে লিখ্‌বো না-ই বা কা'র কথায়! একে তো আর লোকচক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে প্রশংসা কুড়োতে চাইনে! তবে? এমনি করেই রাতের পর রাত ধরে তাঁর মানস-লোককে বাস্তব-জগতের কোলাহলের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে আরম্ভ করেন। একদিন তাঁর নাটকের যবনিকা উন্মোচনও হোল! সেদিন কিন্তু তাঁর পক্ষে স্বপ্নেও কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে, তাঁর এই নাটক অল্পকাল মধ্যেই জগৎ জোড়া খ্যাতিলাভ করবে এবং পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-সমাজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হবে। অথচ সে-সময় এই বইখানা নিয়ে তিনি বিলাতের বিভিন্ন রঙ্গালয়ের দ্বারে দ্বারে অভিনয়ের জন্য ভিখারীর মতো ঘুরেছেন! কেউ তাঁর বই অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করে নি, পরন্তু বিনিময়ে সবাই একটুখানি বিদ্রূপের হাসি উপহার দিয়েছে! কিন্তু অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস! আজ তাঁরই সেই বইয়ের অভিনয়ের অনুমতি পেলে প্রত্যেক রঙ্গশালার অধ্যক্ষ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন!

এই নতুন নাট্যকারের নাম আর, সি, শেরিফ্। এ দেশের পাঠক-পাঠিকারা কেউ কেউ সম্ভবতঃ 'জার্নিস্ এণ্ড'-এর নাম শুনে থাক্‌বেন, কারণ এদেশের রঙ্গমঞ্চে একাধিকবার বিশেষ সমারোহের সহিত এ-বই অভিনীত হয়েছে। কিন্তু নাটকের চেয়ে নাটক-রচয়িতার খ্যাতি অনেক কম। এমন লোকের সংখ্যাই বোধ হয় আমাদের দেশে বেশী, যারা নাট্যকারের নাম আদৌ জানেন না—পরন্তু 'জার্নিস্ এণ্ড' সম্বন্ধে অনেক কিছুই খবর দিতে পারেন।

এ-বই ছাড়া শেরিফ্ আর কোনো নতুন নাটক রচনা করেছেন বলে শোনা যায় নি। কিন্তু বিলেত এবং আমেরিকার নাট্য-সমালোচকগণ বলেন, শেরিফ্ যদি আর কোন বই না-ই রচনা করেন, তা' হলেও তাঁর খ্যাতি কোনোদিন মলিন হওয়ার সম্ভবনা নেই। 'পথ-যাত্রার শেষ'ই তাঁর নাট্য-প্রতিভাকে বিলিতি রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

করে' রাখবে। কিন্তু শেরিফ যে এই নাটক লিখে' কেবল প্রশংসাই পেয়েছেন, তা' নয়, সে-সঙ্গে অর্থও উপার্জ্জন করেছেন প্রচুর! বিলেত, বার্লিন, প্যারী প্রভৃতির বিভিন্ন রঙ্গালয়ে এই নাটকাভিনয়ের সুযোগ-লাভ করার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চলেছে। মুদ্রিত বই প্রতিদিন দশ বিশ হাজার ক'রে বিক্রি হয়েছে। নাট্যকার তাঁর নিজের আত্মকথায় সম্প্রতি লিখেছেন, 'যেদিন এই নাটক রচনা করি, সেদিন এত সৌভাগ্যের কল্পনাও আমার মনে উদয় হয় নি। নিজের অবসরবিনোদনের জন্যই আমি রচনা সুরু করি; কিন্তু একথা সত্যি যে, এই অপ্রত্যাশিত খ্যাতি ও ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন ক'রে আমি আনন্দ পেয়েছি যতখানি, বিস্মিত হয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি।'

কিন্তু বিস্ময়-বোধের কোনো কারণ এতে আছে কি? প্রকৃত সাহিত্য কোনদিন ব্যবসায়-বুদ্ধি বা ব্যবসায়ের প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। একান্ত সৃষ্টির আনন্দ থেকেই তার উৎপত্তি। এই সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হ'য়েই বহু কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার যুগে যুগে সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারকে মণিরত্নে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সৃষ্টির মুহূর্ত্তে তাঁদের যশ বা খ্যাতি—কোনকিছুই আকাঙ্খা হয়তো ছিল না, পরে একদিন সহসা ঘুম থেকে উঠে বায়রণের মতো আবিষ্কার করেছেন যে, তাঁদের খ্যাতি স্বদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে নব-অরুণালোকের মতো সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। শেরিফের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে।

'জার্নিস্ এণ্ড'—এর বিষয়-বস্তু সাধারণতঃ বিগত মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিলেত এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকগণ যুদ্ধকে ভিত্তি করে অনেক নাটক উপন্যাস রচনা করেছেন। রিমার্কের বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস All Quiet on the Western Front-ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই রচিত হ'য়েছে এবং শেরিফের এ-বইও সেই শ্রেণীর। কিন্তু কেবল এ-টুকু বল্‌লেই এর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। কেবল হত্যা, যুদ্ধ, গোলা-বারুদই এই নাটকের সর্ব্বস্ব নয়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে স্বার্থের সংঘাত হয়; একপক্ষের জয় অন্যপক্ষের পরাজয় বা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হওয়ার পর সমাপ্তি,—এ তো নিতান্তই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু জয়-পরাজয়ের বাইরেও যোদ্ধা-জাতির জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন আলোড়ন ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধের পরও থেকে যায়। যুদ্ধের এই প্রতিক্রিয়ার কাহিনীই 'জার্নিস্ এণ্ড'-এর মর্ম্ম কথা। যুদ্ধের বিভীষিকা মানুষের জীবনে কত দিক দিয়ে কত রকমের ক্ষতি ও গ্লানি এনে দেয়, তারি একটি জলন্তচিত্র শেরিফ নিপুণ তুলিকা দিয়ে এঁকেছেন। যুদ্ধের ভাল মন্দ প্রতিপন্ন করতে গিয়ে কোথাও মানুষকে অবহেলা করেন নি। মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না 'জার্নিস্ এণ্ড'-এর প্রতি দৃশ্যে জীবন্ত হ'য়ে ফুটেছে। মানবতার আবেদনকে অগ্রাহ্য করেন নি বলেই শেরিফের নাটক আজ এতদূর প্রিয় হ'তে পেরেছে। বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে, আধুনিককালে যুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে যতগুলো নাটক রচিত হয়েছে, তাদের ভেতর 'জার্নিস্ এণ্ড' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এই নাটক সম্বন্ধে একটি ঘটনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। শেরিফ এই নাটক রচনা শেষ করে একখণ্ড পাণ্ডুলিপি য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম নাট্যকার বার্ণার্ড শ'র কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁর মতামত জানতে চান। শ' সে-সময় প্যারীতে ছিলেন, পাণ্ডুলিপি সেখানেই পাঠানো হয়। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই জানা গেল, শ' প্যারী থেকে সুইটজারল্যাণ্ড-এ চলে গেছেন। বহুকাল উত্তর না পেয়ে শেরিফ পাণ্ডুলিপি ফেরৎ পাওয়ার আশা ছেড়ে দেন এবং অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু অনেক দিন পরে পাণ্ডুলিপিখানা ফেরৎ এল। শ' নাটকখানা পড়ে' লিখেছিলেন—'নাটকটিকে তুমি অযথা ঘটনার ভারে বিড়ম্বিত করেছ বলে' মনে হ'লো। এর আখ্যান-ভাগ নিয়ে অন্ততঃ পাঁচখানা বড়ো এবং ভালো নাটক রচিত হ'তে পারতো। তা ছাড়া এ বই লিখে' তুমি লাভবান হ'তে পারবে না।' শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটক যাঁর কাছে 'ছেলেমানুষি' আখ্যা পেয়েছে, তরুণ নাট্যকার শেরিফ এর চেয়ে কোন 'প্রশংসা' আশা করতে পারেন কি? কিন্তু, আজ শ'র সমস্ত আশঙ্কাই ব্যর্থ হয়েছে!

শ্রীসত্যেন্দ্র দাস

ডক্টর কালিদাস নাগের বিদেশ যাত্রা

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, "বৃহত্তর ভারত পরিষদের" প্রসিদ্ধ সম্পাদক অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ এম, এ, ডি-লিট্ মহাশয় ইউরোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক 'ভারতীয় কলা ও পুরাতত্ত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি New York-এর The Carnegie Institute of International Education-এ ১৯৩০—৩১ সালের Visiting Professor নিযুক্ত হইয়াছেন। এখানে ১৯৩০-এর অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়া তিনি আমেরিকার অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন।

আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ—জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে Geneva School of International Studies-এর তরফ হইতে তাঁহার কাছে "বৃহত্তর ভারত" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত Munich-এর German Academy, Czecoslovakia-র Oriental Institute, Prague বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানা ইউরোপীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক অধ্যাপক নাগ আহুত হইয়াছেন। আমরা ডক্টর নাগের এই নিমন্ত্রণে অত্যন্ত গৌরব বোধ করিতেছি। আজ ভারতের জাতীয়তার দিনে বিদেশীগণ ভারতের অপর সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধেও যে বিদেশীর আগ্রহ বাড়িয়াছে, ডাক্তার নাগের এই নিমন্ত্রণে তাহা সুস্পষ্ট। "বৃহত্তর ভারত পরিষদের" সম্পাদকরূপে তিনি ভারতের সহিত নানা বিদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন।

এখানে অধ্যাপক নাগের জীবন সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানাইতেছি। তিনি 'কল্লোলের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অধ্যাপক নাগের জীবনেতিহাস অপরিসীম সাধনার ইতিহাস। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি জীবনের আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন্ নাই।

এম, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইবার পরই তিনি Scottish Church College-এ পাঁচ বৎসর ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। তাহার পর তিনি Ceylon-এর Mahinda College-এর Principal পদে নিযুক্ত হন। Ceylonএ তিনি এক বৎসর ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন।

Franceএর বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক Sylvan Levi ও অন্যান্য মনীষীর কাছে গবেষণা করিয়া তিনি Paris University হইতে D. Litt উপাধি লাভ করেন। ডক্টর নাগ তাঁর Thesis ফরাসী ভাষায় লেখেন। France-এ থাকিবার সময় ফরাসী কবি Pierre Jean Jouve-এর সহিত তিনি প্রথম বাঙলা মূল হইতে ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" কাব্য গ্রন্থখানির অনুবাদ বাহির করেন। তিনি মনিষী Romain Rolland-এর সহিত বিশেষ স্নেহ ও সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ। মহাত্মা গান্ধীর জীবনী লিখিবার সময় Rolland অধ্যাপক নাগের কাছে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৯২৩ সালে Europe হইতে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। এই সময় হইতেই তিনি কল্লোলের বহুবিধ সাহায্য করিতে থাকেন। তাঁহারই আগ্রহে স্বর্গীয় গোকুলচন্দ্র প্রথম কল্লোলে Rolland-এর সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফ্ বাঙলায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক নাগ মূল ফরাসী গ্রন্থ হইতে গোকুলকে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিতেন। গোকুলচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার ডক্টর নাগ ও তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী বি, এ, মহাশয়া নিজ ইচ্ছায় গ্রহণ করেন। নানাবিধ কাজের ভিতরও ইঁহারা কল্লোলের জন্য প্রতি মাসে অনুবাদটি যোগাইয়া যাইতেন। এ জন্য কল্লোল ইঁহাদের উভয়ের কাছে চিরকাল ঋণী থাকিবে!

কিছুকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের সহিত অধ্যাপক নাগ চীন জাপান ভ্রমণ করিয়া আসেন। ডক্টর নাগের জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব বেশী। বর্ত্তমানে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে "বৃহত্তর ভারত পরিষদের" কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিতেছেন।

ডাক্তার নাগের বিদেশ যাত্রার প্রারম্ভে আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহার মুখ হইতে ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিকথা শুনিবার জন্য বিদেশীরা আজ আগ্রহান্বিত, ইহা ভারতেরই গৌরব। ভগবান তাঁহাকে সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রদান করিয়া তাঁহার উচ্চ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করুন ইহাই প্রার্থনা করি।

ডক্টর নাগ কল্লোলের বহু সংগ্রামের দিনে তাঁহার সাহচর্য্য ও সহানুভূতি দিয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। দীর্ঘ সাত বৎসরের ছোট-বড় বহু বিপদ-আপদের বিষয় অধ্যাপক নাগ জানেন, আজ তাই আমাদের পরমাত্মীয়ের বিদেশ যাত্রায় আমরা আন্তরিক প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা জানাইতেছি। অধ্যাপক নাগের ধৈর্য্য, কর্ম্মপ্রবণতা, হৃদয়ের অসীম শক্তি ভারতবর্ষের সমস্ত যুবক সমাজের আদর্শের বিষয়।

অতি অল্পকালের মধ্যেই গোকুলচন্দ্রের ভাই ও নিকটতম বান্ধব কালিদাস নাগ আমাদেরও সুখ দুঃখের সমভাগী পরম বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ মনে হয়, তাঁহার দান আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও কল্লোলে অপরিশোধ্য হইয়াই থাকুক।

পুস্তক ও পত্রিকা

পরিচয়লিপি

সাধারণ স্বত্ত্ববাদীর ইস্তাহার

কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌম্যেন্দ্রনাথের রচনাবলী সংখ্যায় স্বল্প হইলেও, তাহা সত্য সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। চিন্তাশীলতার দ্বারা যে-সত্যকে তিনি সমগ্র অন্তরের সহিত উপলব্ধি করেন, স্পষ্ট ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিবার নির্ভীকতা তাঁহার আছে।

উক্ত পুস্তিকাখানি বিখ্যাত *Menisto of the Communist Party*-র বাংলা অনুবাদ। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাধারণ স্বত্ত্ববাদের অন্যতম জন্মদাতা কার্লমার্ক্স এবং তাঁহার সহচর ফ্রেডারিশ এ্যাঙ্গেলস্ উক্ত নামে একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে Communists বা সাধারণ 'স্বত্ত্ববাদীদের' কথা পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। এরূপ একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রচারিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল, সৌম্যেন্দ্রনাথ সে অভাব মোচন করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের ভঙ্গীও যেমন সরল, ভাষাও তেম্‌নি স্বতোৎসারিত। তিনি নিজে একজন সাধারণ সত্ববাদী; Proletariat বা 'আত্মোৎপন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায়ের' উন্নতিকামনায় পৃথিবীব্যাপী যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ঘোষণাবাণীর সহিত এ দেশের জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই তাঁহার উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য।

পুস্তিকাখানির দাম ছ'আনা। Workers and Peasants Party of India হইতে আব্‌দুল্ হালিম কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্ব-দর্পণ

শ্রীশচীন্দ্রকুমার সাহা এম্, এ

পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবিকে বাংলার জনসাধারণের চোখে প্রকাশ করাই 'বিশ্বদর্পণে'র

উদ্দেশ্য। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ বা বল্‌শেভিক্‌বাদ—ইহার কোনটাই আমার কাম্য নহে। তাই কোন মতবাদের প্রতি পক্ষপাত না দেখাইয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে ইহাদের সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

গ্রন্থটিতে অনেক জ্ঞাতব্য রাজনৈতিক তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে। ভাষাও প্রাঞ্জল। গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র সমবায়-নীতিই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু মানুষের মনে যতদিন লোভ ও হিংসার রাজত্ব চলিবে, ততদিন সে আশা সুদূর পরাহত মনে হয়।

দাম একটাকা। প্রকাশক—শ্রীবারীন্দ্রকুমার চন্দ, বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা।

জীবন ধারা

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি উপন্যাস। মানবের জীবনধারা যে কি বিচিত্রগতি, লেখক তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বী সত্যরঞ্জন কেমন করিয়া সংসার-নীড়ে বন্দী হইয়া পড়িল, ইহাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। লেখকের রচনা নির্দ্দোষ নহে. স্থানে স্থানে ভাষার অসামাঞ্জস্য চোখে পড়িল। উপন্যাসের বিপুলতা ছাড়িয়া লেখক যদি ছোট গল্প লিখিতেন, তবে তাঁহার রচনা উন্নতি হইত বোধ হয়।

পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠব পরিপাটি, দাম দেড় টাকা। লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মানবজীবনের অভিব্যক্তি

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত বিদেশী মনীষীদের কয়েকটি গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, মানবজীবনের ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে লেখক উক্ত প্রবন্ধপুস্তক রচনা করিয়াছেন। যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা, ভাষা ও আধ্যাত্মিক জীবন কেমন করিয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহার বিষয়েই গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে চিন্তা-শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মূল্য এক টাকা।

ফুলধনু

শ্রীঅমরকিশোর দাশগুপ্ত

একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। ভাষা, ছন্দ, ভাব—সবই বিশেষত্ব-হীন। এ রকম বই প্রকাশ করার কি সার্থকতা আছে, বুঝিতে পারিলাম না। ছাপা ভাল। কমলা বুক-ডিপো হইতে প্রকাশিত।

গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট
বিশেষ নিবেদন

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে আপনাদের নিকট আজ একটি নিবেদন করিতেছি। আশা করি আপনারা আমার অযোগ্যতা ও অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এই সাত বৎসর ধরিয়া 'কল্লোল' মাসিক পত্র সুচারুরূপে চালাইবার জন্য আমি ও আমার সহকর্ম্মীগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এই কয়বৎসরে আমি এত অধিক ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমার পক্ষে এখন আর একমাসও কল্লোল চালান সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আগামী মাঘ সংখ্যা হইতেই আপাততঃ কল্লোল প্রকাশ করা বন্ধ করিতে হইতেছে। যদি কখনও পারি নূতন করিয়া কল্লোল আবার চালাইতে চেষ্টা করিব। আশা করি তখন আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইব না। আমি জানি, গত কয়েকমাস ধরিয়া আপনাদের কল্লোল পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে। বিলম্ব যে ইচ্ছা করিয়া করি নাই তাহা বোধহয় এখন বুঝিতে পারিবেন। ইহার উপর আমার নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় আরও বিপন্ন বোধ করিতেছি। নতুবা অন্ততঃ বাকী এই কয়মাস কাগজ চালাইতে চেষ্টা করিতাম।

আপনারা সমগ্র বৎসরের চাঁদা দিয়াছেন কিন্তু কাগজ পাইলেন মাত্র পৌষ মাস পর্য্যন্ত। সেই জন্য ন্যায়ত ও ধর্ম্মত আমি আপনাদের কাছে ঋণী রহিলাম। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই আমাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল ইহা আপনারা বিশ্বাস করিবেন আশা করি।

আপনারা জানেন কোনও ধনীব্যক্তি ইহার সাহায্য করেন না। যতদূর ও যতদিন পর্য্যন্ত নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে কুলাইয়াছে ততদিন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যে সকল ছাপাখানা ও কাগজ ব্যবসায়ী আমাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য টাকা ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের সে ঋণ পরিশোধ করিয়া উঠিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

রক্ত দিয়া গড়া জীবনের একটি আদর্শ বস্তুকে রূপ দিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না—ইহার দুঃখ যে কতখানি তাহা আপনাদের সহৃদয়তাগুণে বুঝিতে পারিবেন।

আমার যে সকল বন্ধুবর্গ ও হিতৈষী কল্লোলের জীবন-ধারায় নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, আজ এই দিনে তাঁহাদের প্রত্যেককে কৃতজ্ঞঅন্তরে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের সৌজন্যের ঋণ অপরিশোধ্য। আমার সহকর্ম্মী ও সহৃদয় বন্ধু, কল্লোলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, স্বর্গীয় গোকুল চন্দ্র নাগের মৃত্যুশয্যার অনুরোধের কথা স্মরণ হইতেছে। কিন্তু তাঁহার সে শেষ ইচ্ছা আর পালন করিতে পারিলাম না। কল্লোলকে বাঁচাইয়া রাখা আর সম্ভব হইল না।

তাই সকলের নিকট আজ বিনীত হৃদয়ে আমার সকল ত্রটী, সকল অযোগ্যতা ও সকল অক্ষমতার জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

যিনি সকল সংগ্রামে, সকল বিপদে, সকল গৌরবে একান্ত নিকটে থাকিয়া সুখদুঃখের বোঝা বহিয়াছেন, সেই অন্তরের দেবতাকে প্রণাম করি। ইতি—পৌষ, ১৩৩৬।

বিনীত

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ।

IMPERIAL LIBRARY

Published by Dinesh Ranjan Das from 10-2, Patuatolla Lane and Printed by the same at the Britannia Printing Works, 1, Bibi Rozio Lane, Bowbazar, Calcutta.

কি ছিলাম !—
কী হয়েছি !
ভাঙ্গা শরীর শোধরা'তে
সুরবল্লীর মত কেউ না।
সুরবল্লী কষায়
বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।
সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯, কলুটোলা
কলিকাতা।

KALLOL December, 1929. Regd. No. C. 1157.

অষ্টাঙ্গ—আয়ুর্ব্বেদ কলেজ-হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ, কাব্যতীর্থ, সাংখ্যরত্ন, বিদ্যাভূষণ

ও কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

ও

তত্বাবধানে পরিচালিত

জগদ্বন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

-নীহারিকা তৈল-

নারী-সৌন্দর্য্যের
আয়ুর্ব্বেদীয়
শ্রেষ্ঠ দান

কেশের পরিপুষ্টিসাধনে
শ্রী ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে
ইহা অদ্বিতীয়

কেশের অকালপক্কতা ও চুলউঠা নিবারণ করিয়া চুলের গোড়া শক্ত করিতে ইহা সিদ্ধহস্ত এবং বায়ুরোগ প্রতিশেধক ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় কেশতৈল। স্নানের পূর্ব্বে মাখিলে ইহার স্নিগ্ধকর-সুবাস মন-প্রাণ পুলকিত করে।

প্রত্যেক বড় বড়
ষ্টেশনারি দোকানে
পাওয়া যায়।

মূল্য—১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুলাদি ।৶০ আনা।
৩ শিশি ২৸৵০ আনা ৬ শিশি ৫॥৵০ আনা।

মফঃস্বলে ও টাউনে
সর্ব্বত্র
এজেণ্ট আবশ্যক।

জগদ্বন্ধু আয়ুর্ব্বেদ ভবন

১১৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

(961)